Vol. 33 | No. 2 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# বাংলা গদ্যের বিবর্তন

| | |
|---|---|
| Volume | 33 |
| Issue | 2 |
| Year | 1990 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | সফিউদ্দিন আহমদ |
| Published online | February 1, 1990 |
| DOI | 10.62328/sp.v33i2.2 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v33i2.2 |
| Pages | 19-112 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# বাংলা গদ্যের বিবর্তন

সফিউদ্দিন আহমদ

## এক

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ আর পুরাণ-পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য এবং পুঁথি সাহিত্যের যুগে নেই। ভৌগোলিক সীমাকে ডিঙিয়ে তা' বৈশ্বিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণায় ভাস্বর এবং মানব-মনের চিরন্তন বাণী হয়ে বিশ্বের দরবারে গর্ব ও গৌরবের আসনে মহিমান্বিত। কিন্তু এরই মধ্যে বাংলা গদ্য-ভাষাকে যে কতোবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে এখানে তাই আলোচনা করা হবে।

বিজাতি ও বিভাষীর আক্রমণে বাঙালীই শুধু রক্ত সংকর হয়নি—বাংলার সংস্কৃতি এবং বাংলা-গদ্যের বিপর্যয় ঘটেছে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, বিজাতির আক্রমণ ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের প্রবল স্রোতে আমাদের সংস্কৃতি যেমন স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য না হারিয়ে বিজাতির যা ভালো তা আত্মস্থ করে ঋদ্ধ হয়েছে---তেমনি বাংলা-গদ্য ও বারবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও স্বকীয়তা হারায়নি বরং বিজাতির শব্দ-সম্পদ ও ভাবৈশ্বর্যকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে---সমস্ত বাধার আল ও প্রতিকূলতাকে ডিঙিয়ে এর গতিপথকে আরো প্রশস্ত ও উজ্জ্বল করেছে। অথচ বাংলা গদ্যের এ বিপর্যয় ও বিবর্তনের দিকে তাকালে আজ আমরা বিস্মিত হই।

বিদেশী ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের বাংলা-গদ্য বাংলা ভাষার হৃদয় ও প্রাণ-প্রবাহ হতে স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত ধারায় উৎসারিত হয়নি। প্রথমে বাঙালীর হাতে গড়ে উঠা বাংলা গদ্যের মৌল ভিত্তিকে অস্বীকার করে জোর করে গড়ে তোলা মৌলভিত্তি-বিচ্যুত এক কৃত্রিম গদ্য রীতিই শিল্পরূপ পেয়েছে যার প্রভাব হতে আজকের পরিণত গদ্যও বিমুক্ত নয়।

পর্তুগীজ পাদরী, ইংরেজ ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বাংলা গদ্য চর্চায় কোনো শিল্পীমন বা সাহিত্যিক মানসিকতাতো ছিলোইনা বরং এর মৌলধারা ও প্রাণপ্রবাহের সাথেও তাদের কোনো সম্পর্ক ছিলোনা, প্রয়োজনের তাগিদটাই ছিলো প্রবল। এবং তারা এ-ও মনে করতো যে, তাঁরাই প্রথম গদ্য লিখছেন,[১] ফলে বাংলা গদ্যের মৌল ধারাও প্রাণ-প্রবাহ এবং স্বাভাবিক রীতিটি তাঁরা হঠাৎ করে আত্মস্থ করতে পারেন নি। তাই শুধু প্রয়োজনের তাগিদে শক্তি প্রয়োগ করে নিজ নিজ ভাষার ছাঁচে ঢেলে কৃত্রিম এক গদ্যরীতি তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন যা বাংলা গদ্যের বিকাশের পথে বিপর্যয় এনেছে বার বার।

চর্যাপদকে শুধু বাংলাভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এর সমস্যাকে যেমন জটিল করে তোলা হয়েছে তেমনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হতে বাংলাগদ্যের বিকাশ[২]—এ ধারণা হতেই বাংলা গদ্যের ইতিহাসকেও জটিল করা হয়েছে। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা যেমন অনস্বীকার্য তেমনি এর বিপর্যয়ের ভূমিকায় আরো বেশী স্বীকার্য।[৩]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পূর্বের বাংলা-গদ্যের নিদর্শন স্বরূপ দলিল-দস্তাবেজ সরকারী চিঠি পত্রের কথা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়—দলিল দস্তাবেজ ও সরকারী চিঠি-পত্র কখনো সাহিত্যিক বা শিল্পিত গদ্যের নিদর্শন নয়। অফিস-আদালতের ভাষা একটা নির্দিষ্ট কাঠামো ও টাইপধর্মী। শত শত বছরেও এর বিশেষ কেনো পরিবর্তন হয়না। যেমন বর্তমানের আদালতের সমন ও ডিক্রির ভাষা এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিলের ভাষার সাথে দুইশত বছর পূর্বের ঐসব ভাষার কোনো পার্থক্য নেই। কোনো এক কারণে যদি রবীন্দ্র-নজরুল থেকে আরম্ভ করে তাবৎ সাহিত্যিক-গদ্য নষ্ট হয়ে যায় তবে সচিবালয় ও অফিস আদালত হতে কিছু দলিল দস্তাবেজ ও নথিপত্র এবং আবেদন পত্রের নজীর দিয়ে দিয়ে বা এ ধরনের কিছু গদ্যের নিদর্শন দিয়ে কি বলবো যে, এই ছিলো সেদিনের বাংলাগদ্য, তাহলে কি ঠিক হবে? প্রাচীন বাংলাগদ্য সম্বন্ধেও আমাদের মানসিকতা ঠিক তাই। অর্থাৎ দলিল দস্তাবেজ থেকেই আমরা নমুনা গ্রহণ করে থাকি। ফলে গদ্য সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাস সন্ধানে প্রায়শই ভ্রান্তির বশীভূত হতে হয়।

## দুই

বাংলা ভাষার প্রধান গুণ—সারল্য, ঐক্যসমতা, স্বচ্ছতা, প্রসাদগুণ ও সংযম এবং ধ্বনিমাধুর্য। প্রথম থেকেই বাংলা গদ্যে এ-গুণগুলো দেখা যায়। বাংলাগদ্যে যা জটিলতা, আড়ষ্টতা, দুর্বোধ্যতা ও কৃত্রিমতা তা একদিকে এসেছে বিদেশীদের গদ্য সৃষ্টিতে, যাদের সাথে বাংলা ভাষার প্রাণস্পন্দন ও নাড়ীর কোনো পরিচয় ছিলোনা; অপরদিকে এসেছে রাজতোষণে, বিদেশী শব্দ ব্যবহারে, এবং ইংরেজ ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃতায়নে।

৬৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলাভাষার লেখ্য ও শিল্পিতকালের সীমারেখা ধরে বাংলা ভাষার প্রথম কবির সম্মান ও শিরোপা দিতে হয় মৎসেন্দ্রনাথ বা মীননাথকে[৪]। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যের কথা আসে আরো অনেক পরবর্তীকাল থেকে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা কালতো মাত্র সেদিন থেকে। প্রকাশকালের দিক দিয়ে অলোচনা করতে গেলে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ ভাষার ইতিহাস' (১৮৭১) পুস্তকাকারে প্রকাশিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩) দ্বিতীয় গ্রন্থ। কিন্তু রচনাকাল নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থ মহেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগে রচিত। এজন্য প্রকাশকাল পরে হলেও ন্যায়রত্ন মহাশয়কেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর প্রথম আলোচিত গ্রন্থের রচয়িতার সম্মান দিতে হয়।

এখানে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত প্রথম দিকের কিছু গ্রন্থের উল্লেখ করছি—

ক গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব : পদ্মনাভ ঘোষাল ও অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫)

খ The Literature of Bengal : রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৭৭)

গ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা : রাজনারায়ণ বসু (১৮৭৮)

ঘ বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা : গঙ্গাচরণ সরকার (১৮৮০)

ঙ বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৮১)

চ বাঙ্গালা সাহিত্য : কৈলাসচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৫)

ছ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৯৬)

প্রাচীন বাংলা গদ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রথম তথ্যভিত্তিক সংবাদ দেন কৈলাসচন্দ্র ঘোষ। তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্য' (১৮৮৫) গ্রন্থে—ষোড়শ শতাব্দী ও এর আগে থেকেই বাংলা গদ্যের অস্তিত্বের কথা তিনি বলেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি তুলে ধরেছেন বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব-বিষয়ক কিছু কিছু গদ্যরচনা এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে প্রথম গদ্য লেখক হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আনিসুজ্জমানের মন্তব্য হলো—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে বাংলা গদ্যের আদি লেখক বলার সঙ্গত কারণ নেই। কেননা বিদ্যাপতির গদ্য রচনা বাংলায় নয় এবং চণ্ডীদাস নামধারী লেখকের যেসব গদ্য রচনা বাংলায় পাওয়া যায়, তা কোন্ চণ্ডীদাসের কিংবা আদৌ চণ্ডীদাসের কিনা, সেকথা বলা শক্ত। তবে কৈলাস-চন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে, বৈষ্ণব সহজিয়া লেখকদের গদ্য-গ্রন্থের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং ইংরেজ আমলের আগে বাংলা গদ্য বিকাশের সম্ভবপরতা সম্পর্কে তিনি আস্থাজ্ঞাপন করেন।[৫]

দীনেশচন্দ্র সেন কৈলাস ঘোষের কথা মেনে নিয়ে পুরোনো গদ্য সম্বন্ধে বলেন—'গদ্যরচনার নমুনা না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহা একরূপ নগণ্য। ···সেই ক্ষুদ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গদ্য রচনাগুলি নব্য সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে'।[৬] বাংলা গদ্য সম্বন্ধে আমরা আরো সংবাদ পাই নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ' (১৯০৭)-এর বাংলা সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায়। দীনেশচন্দ্র সেনের History of Bengali Language and Literature (১৯১১) ও Bengali Prose Style (১৯২১) তাঁরই সমর্থনে লেখা। শুধু দীনেশচন্দ্র সেন নন পরবর্তীকালে যাঁরা বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন তাঁরা সকলেই নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষে' হাত পেতেছেন। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, দীনেশ বাবু তাঁর Bengali Prose Style গ্রন্থে বাংলা গদ্যের সূচনাকাল ধরেছেন দশম শতাব্দী হতে। আর শিবরতন মিত্র বলেছেন Bengali prose is entirely a creation of the nineteenth century.[৭]

## তিন

বাংলা গদ্য সৃষ্টির কারিগর যে পোর্তগীজ বা ইংরেজ এ-ধারণা পোষণ করেছেন সজনীকান্ত দাস তাঁর 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে'। ফোর্ট

উইলিয়াম কলেজের পূর্ববর্তী সম্পূর্ণকালকেই হয় তো তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলতেন কিন্তু অন্ধকার ভাগের কিছুটা আলোকিত হয়ে গেলো 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৪৩) প্রাপ্তির সংবাদে। অবশ্য এর পূর্ববর্তী কালকে সজনীবাবু অন্ধকার যুগই বলেছেন। তাঁর ভাষায়—কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই নয়শত বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যের স্থান নেই। খ্রীস্টীয় ১৭৪৩ অব্দে পোর্তগালের লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্য গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মুদ্রিত হয়। এই তারিখকে বাংলা গদ্যের প্রামাণিক যুগের সূত্রপাত ধরিয়া বাংলা ভাষার জন্ম হইতে (৯০০ খ্রী.) উক্ত ১৭৪৩ খ্রী. পর্যন্ত ৮৪৩ বৎসর বাংলা গদ্যের অন্ধকার যুগ।[৮]

পুরোনো বাংলা গদ্য যে শুধু চিঠি-পত্র ও দলিল দস্তাবেজ নয় এবং তাম্রফলকও নয়---সাহিত্যিক গদ্য, একথা প্রথম স্পষ্ট করে বলেছেন সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে। তাঁর উক্তি ও উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি—১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে নকল করা একটি নিবন্ধের ভাষা সাহিত্যের গদ্য বলতে পারি। নিবন্ধটির আরম্ভ—শ্রীগুরুর শিষ্যকে কৃপা করিয়া দেহের পার্থিবাদি পঞ্চভূতের অচৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া পরে নিত্য শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীবৃন্দাবন সাধক সিদ্ধকরূপে শ্রীরাধা কৃষ্ণাদিকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে শিষ্যের অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞান জন্মাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন। ...পরে সেই জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ কহিলেন তোমার সুজ্ঞান আদি জন্মিয়াছে তুমি শ্রীবৃন্দাবনে প্রেম লক্ষণার রসময়ী ভক্তিতে বিরাজ কর। ইতি বেদাদি যোগশাস্ত্রের অনুসারে নিষ্কাম ধর্মের জ্ঞানাদিসাধন কথা সপাপ্ত।[৯] এ গদ্যের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ডক্টর সেন বলেছেন---অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতেই যে বাঙ্গালা গদ্যের সাহিত্যিক ভঙ্গির কাঠামো প্রকটিত হইয়াছিল তাহা উপরে উদ্ধৃত নিদর্শন হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে বাঙ্গালা গদ্যের সাধুরূপ নিতান্ত অপরিণত ছিলো না তাহারও উপযুক্ত প্রমাণ মিলিতেছে।[১০] এরপরও তাঁর স্ব-বিরোধী উক্তি---'গদ্য সাহিত্যের উদ্ভবের সম্ভাবনা প্রাচীন সাহিত্যে অসম্ভাবিত ছিল'।[১১]

পুরোনো বাংলা গদ্যের উপর প্রামাণ্য গবেষণা করছেন ডক্টর আনিসুজ্জামান। তিনি শুধু কয়েকশত চিঠি-পত্রেরই সন্ধান দেননি—ধর্মীয়

এবং নাট্য গ্রন্থেরও সন্ধান দিয়েছেন। এখানে ডক্টর আনিসুজ্জামান-এর বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরছি—"পুরোনো বাংলা গদ্যের জ্ঞাত নমুনার সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের কিছু অজ্ঞাতপূর্ব উপকরণ সাম্প্রতিককালে আমাদের হাতে এসেছে। এ থেকে সাহস করে বলা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দী থেকে মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে বাংলা গদ্যের—কাজের গদ্যের এবং ভাবের গদ্যের—নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এই সময় থেকে এমন নিদর্শন পাওয়ার একাধিক ঐতিহাসিক কারণ আছে। ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণা করেছেন, এ কথা সর্বজন বিদিত। তাই শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়, রাজরাজড়ার চিঠিপত্রে, ব্যবসা বাণিজ্যে, দলিল-দস্তাবেজে বাংলার যথেষ্ট ব্যবহার ঘটেছিলো। ···সপ্তদশ শতাব্দীর একাধিক মুঘল শাসনকর্তা স্বাক্ষরিত বাংলা চিঠি পাওয়া গেছে। ···এসব পত্রে সুলতানী আমলে প্রচলিত রীতির অনুবৃত্তিরই পরিচয় আছে। ···মুরশিদকুলি খাঁর দরবারে বৈষ্ণব মতাদর্শ ঘটিত বিতর্ক অনুষ্ঠানের পরিণামে নবাবের মোহুহর-অঙ্কিত বাংলায় লেখা জয়পুত্রের অস্তিত্ব আছে। ···ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে আসাম, কাছাড়, কোচবিহার, ত্রিপুরা ও মল্লভূমির মতো রাজ্যের সরকারী কাজের ভাষাও ছিলো বাংলা। ১৫৫৫ খৃঃ লেখা মহারাজ নারায়ণের পত্র তারই পরিচয় স্থল।

তবে আরো ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বৈষ্ণব মহাজনেরা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে বাংলা ভাষাকেই বাহন হিসেবে গ্রহণ করে তার ব্যাপক চর্চা করেছিলেন তারা। সে চর্চা পদ্য ছাড়িয়ে গদ্যকেও আশ্রয় করেছিলো।···তখন বৈষ্ণব সাধনায় মার্গভেদ সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বৈধীপন্থী ও রাগানুগাপন্থী বৈষ্ণবদের তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় বাংলা গদ্যে বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজনীয়তা তীব্র এবং ঝোঁক প্রবল হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে, বিশেষতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছিল, তারা বাংলা গদ্যেই তত্ত্বকথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুতঃ বৌদ্ধ সহজযানী সাধকেরা যেমন বাংলা কাব্যক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন, ভাবের গদ্য রচনায় তেমনি পথিকৃৎ ছিলেন বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকেরা। সতেরো শতকে

এবং পরে খ্রীস্টান পাদরীরা যেমন এই পথ অনুসরণ করেছিলেন, তেমনি স্মৃতি শাস্ত্র প্রভৃতিও বাংলা গদ্যে লিখিত হয়েছিলো আঠারো শতকে।[১২]

বৈষ্ণব সহজিয়া ও বৈষ্ণব মহাজনেরা তাঁদের তত্ত্বকথা শুধু চম্পূগদ্যে প্রকাশ করতেন না, তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রীয় রায় লিখতে গিয়ে গদ্যও ব্যবহার করতেন। এমনকি অনেক শাস্ত্রীয় বিচার ও রায় সহজ করে বুঝার জন্য এবং অন্যকে বোঝানোর জন্য—গদ্যে টিকা এবং ব্যাখ্যারও প্রচলন ছিলো। এ ধরনের একটি তথ্য দিয়েছেন ডক্টর সুকুমার সেন। 'রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী কি পরকীয়া প্রণয়িণী—ইহা লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বরাবরই মতদ্বৈধ ছিল। ১১২৫ সালে জয়পুরের রাজ্যের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য পরকীয়াবাদ নিরাস করিয়া স্বকীয়বাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে বাদশাহী পরোয়ানা লইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণবগণের প্রধান ছিলেন রাধামোহন ঠাকুর। ইহার সহিত কৃষ্ণদেবের বিচার চলিয়াছিল ছয়মাস ধরিয়া, মালিহাটি গ্রামে রাধামোহনের গৃহে। বিচার শেষ হইলে পর গৌড়ীয় মহান্তগণ বিচারের বিবরণ বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। সেখান হইতে অনুমোদন আসিলে কৃষ্ণদেব সদলবলে আচার্য-পক্ষের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। বিচার পরাভূত কৃষ্ণদেব রাধামোহনের শিষ্য হইলেন। দলিলের সাক্ষী-দের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই নাম পাই—বৈষ্ণব গোস্বামী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গৃহস্থ বৈষ্ণব, হিন্দু মুসলমান ভদ্রলোক, সরকারি কানুনগো ও কাজী।[১৩]

প্রথমদিকের পুরোনো বাংলা গদ্যকে পণ্ডিতজনেরা চম্পূগদ্য হিসেবে অভিহিত করেছেন। এবং সাধুগদ্যের সাথে এ গদ্যের অনেক ব্যবধান বলে পণ্ডিতজনেরা একে গদ্য বলতেও নারাজ। তবে চর্যাপদের সাথে আজকের কবিতার ভাষার ব্যবধানটুকু স্বীকার করে নিলে—সেদিনের চম্পূগদ্যকেও গদ্য বলে স্বীকার করে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে সব পণ্ডিতই শুধু আধুনিক গদ্যের কথাই বলেছেন। কিন্তু পুরোনো বাংলা গদ্যকে অস্বীকার করে যে আধুনিক বাংলা গদ্য হতে পারেনা এ আলো-

চনায় তাদের বড়ো অনীহা। আধুনিক বাংলা গদ্যের বিকাশের পথে অন্তরায় হিসেবে পণ্ডিতজনেরা উল্লেখ করেছেন পয়ারছন্দ ও মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভবে বিলম্বিত কাল। এ কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মবিকাশ ও জীবন জিজ্ঞাসায় তাড়নাই বাংলা গদ্যের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। তাদের যুক্তি, চিন্তা ও বলিষ্ঠ বক্তব্য পয়ারের বৃত্ত আর আটকিয়ে রাখতে পারলোনা। পাশ্চাত্য শিক্ষিত তরুণদের যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা ও ভাবের বাহন হলো গদ্য। কারণ আমরা জানি পদ্য আবেগ, উচ্ছ্বাস ও কল্পনার ভাষা আর গদ্য যুক্তি তর্ক ও বিচার বিশ্লেষণের ভাষা।[১৪] এ সম্পর্কে অবশ্য কোনো পণ্ডিত ও গবেষকেরই মতানৈক্য নেই। নিম্নে আমরা কয়েকজনের মন্তব্য তুলে ধরছি—

১ সমুদ্র পারের সওদাগর ও পাদরীদের আগমনে কবিতাপ্রবণ বাংলাদেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয় তাহার ফলেই সত্যিকার গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ এবং বাঙালীর আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার পরিণতি।[১৪ক]

২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার ছিলোনা। গদ্যের আবেদন যুক্তির কাছে। ধর্মাশ্রিত পুরোনো বাংলা সাহিত্য ছিলো পদাশ্রয়ী, তার অবেদন আবেগ ও অনুভূতির কাছে। পুরোনো বাংলা সাহিত্যের বাহন ছিলো পয়ার ছন্দ। এই ছন্দ সর্ববিধ ব্যবহারের উপযোগী, নমনীয় ও শোষণশক্তি সম্পন্ন। পয়ারের ছাচে গঠিত সরল বাক্যের দ্বারা অনায়াসে ভাব প্রকাশ করা যায়। পয়ারের মানবিক অনুভূতি ও আবেগ যেমন অনায়াসে প্রকাশ করা যায়, তেমনি তত্ত্ব ও যুক্তিমূলক ভাবকেও প্রকাশ করা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে দুরূহ বৈষ্ণব দর্শন নিপুণভবে প্রকাশ করা হয়েছে, পদ্যবাহন কোথাও কবির তত্ত্বালোচনার বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করেনি। তাই অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যে গদ্যের অপরিহার্যতা অনুভূত হয়নি। সে অনুভূতি, সে প্রয়োজন, সে তাগিদ এলো অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের সন্ধিস্থলে—যখন ইংরেজ মারফত আধুনিক জগৎ, যুক্তি ও বাস্তব চেতনা নিয়ে আমাদের উপর এসে পড়লো ও ভারত বর্ষের সহস্রাব্দের তন্দ্রা ভেঙ্গে দিল।[১৫]

৩ ইংরেজ ভারতে এলো, Rhyum অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত কাব্যের চর্চার স্থান Reason অর্থাৎ বিচারমূলক চিন্তা দখল করিল এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হইল।[১৬]

৪ প্রয়োজনের তাগিদে পরে প্রাণের টানে মধ্যবিত্ত সমাজ যে আত্ম বিকাশের বাহনকে আবিষ্কার ও সৃষ্টি করে নিল সেটি বাংলা গদ্য সাহিত্য।[১৭]

বাংলা গদ্যের বিকাশকে যে বিলম্বিত করেছে পয়ার ছন্দ এ আলোচনা আমরা আগেও করেছি। পয়ারের ছন্দ এমনি এক গড়নের যা দিয়ে গদ্য-পদ্য উভয়ের কাজ স্বচ্ছন্দে চালিয়ে যাওয়া যায়। পয়ারের এ সুবিধের জন্যই গদ্যের অভাবটা ততো তীব্র অনুভূত হয়নি। গদ্যধর্মী বক্তব্যকে এতোদিন পয়ারে চালিয়ে দেয়া যেতো বলেই পয়ারের বৃত্ত ভাঙার পালা শুরু হয়নি। শ্রীকুমার বাবুর মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য—'বাংলা কাব্যে এই পয়ারের প্রাধান্য গদ্যরীতির উদ্ভবকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ঠেকাইয়া রাখার আর একটি কারণ। সনাতন প্রথায় অনুবর্তনকারীদের পক্ষে পয়ারের উচ্ছ্বাসহীন, নিস্তরঙ্গ প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়ার মত আরামদায়ক আর কিছু ছিলোনা। বহু শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে ইহা এমন একটি সহজ মসৃণতা লাভ করিয়াছিল, লেখকের বক্তব্য ও মনোভাবের সহিত ইহার এমন একটা চেষ্টাহীন সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠিয়াছিল যে সমস্ত কাব্য প্রচেষ্টা অতীতের এই কারুকার্যহীন সাধারণ ছাঁচে, যেন একটা অনিবার্য মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইতে চাহিত। পয়ারের মধ্যে পদ্যরীতির ছদ্মবেশে গদ্যরীতির প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বই খাঁটি গদ্যের প্রয়োজনীয়তা বোধকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বাস্তবিক এই অতি প্রচলিত ছন্দে গদ্য-পদ্যের এক সাম্যভাবমূলক মিলন দেখা যায়। পয়ারের প্রত্যেকটি চরণ যেন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সরলভাবের unit; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাতে গদ্যের অন্বয়ের পর্যন্ত নিখুঁত অনুবর্তন বজায় আছে। আখ্যায়িকা বিবৃতি, প্রথাবদ্ধ বর্ণনা, বাদপ্রতিবাদ ও কথোপকথন প্রভৃতি কাব্যের যে সমস্ত অংগে বিশুদ্ধ কাব্যোৎকর্ষের মানদণ্ড খুব উচ্চ না হইলেও ক্ষতি নাই, তাহাতে ইহার উপযোগিতা অসাধারণ। মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যের এই বহিরাঙ্গিক আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, পয়ারছন্দের সরল লৌহদণ্ড অবলম্বন করিয়া কাব্য জগতের

ত্রিশংকু কবিতার স্বর্গ ও গদ্যের মর্ত এই দুই এর মধ্যবর্তী প্রদেশে লম্বমান ছিলেন—এই অবলম্বনটুকু না থাকিলে তাহারা বহু পূর্বেই সরাসরি গদ্যের নিম্নলোকে অবতরণ করিতে বাধ্য হইতেন।[১৮]

**চার**

পণ্ডিতজনেরা পুরোনো বাংলা গদ্যে যদি পরিণত ও আধুনিক গদ্য আশা করে থাকেন তবে তা ভুল। প্রথম যুগের গদ্য এমনি হয়—যে অর্থে আমরা যথার্থ গদ্যের কথা বলি তা তখন ইউরোপেও ছিলো না। পুরোনো বাংলা গদ্যকে সে যুগের আবহেই দেখতে হবে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, রেনেসাঁসের আগে ইউরোপের কোনো দেশেও ঠিক পুরোপুরি সাহিত্যিক গদ্যের বিকাশ ঘটেনি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজী সাহিত্যেও সাহিত্যিক গদ্য ছিলো না। শেক্সপীয়র-বেকনের গদ্যও কাব্য-গদ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ড্রাইডেনের হাতে ইংরেজী পদ্য সাহিত্য গদ্যরূপ পায় এবং তাঁরই হাতে ইংরেজী গদ্যের রাজপথ তৈরী হয়। ইংলন্ডে তখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার ঘটেছে। এবং এ মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারেই গদ্যের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্রের সাথে শুধু বাংলাদেশ নয়—পৃথিবীর সব দেশের গদ্যের বিকাশই বিশেষভাবে জড়িত। বাংলা গদ্যের বিকাশকে ত্বরান্বিত করার পশ্চাতেও মুদ্রাযন্ত্রের ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিলো। এ প্রসঙ্গে ফরাসী গদ্যের আলোচনা করা যেতে পারে—ষোড়শ শতকের সূচনায় ভেনিস নগরের পরিবর্তে লিঅঁ নগরীতে মুদ্রণ ব্যবসায় স্থানান্তরিত হল। ইতালি থেকে ফ্রান্সে মুদ্রণ ও পুস্তক ব্যবসায়ের এই স্থানান্তরণ রেনেসাঁস উজ্জীবিত ইউরোপে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভেনিসের এক ছাপাখানার মালিক আলতুস মানুটিয়াস ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে নতুন ইটালিক হরফ তৈরী করে মুদ্রণ ব্যবসায় বিপ্লব আনলেন। শস্তায় অক্টাভো আকারের প্রচুর বই তিনি ছাপলেন। ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর মুদ্রণ ও পুস্তক ব্যবসায় ফরাসী-দের হাতে চলে এলো। এই সময় ফ্রান্স ইতালিতে সামরিক বিজয়ের যে ফলভোগ করেছিলো, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি লাভ হলো এই মুদ্রণ ব্যব-সায়ে। ফ্রান্সের সম্রাট দ্বাদশ লুই মুদ্রণ-শিল্পকে গুরু করভার থেকে অব্যা-হতি দিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস ও তাঁর ভগিনী

নাভারের রানী মার্গেরিট লেখকদের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখা দিলেন এবং ইতালির স্টাইলে রচনায় প্রচুর উৎসাহ দিলেন। মানবতাবাদ, পেত্রার্কান স্টাইল ও প্লেটোনিক দর্শন চিন্তা, এই তিনের সুফল ষোড়শ শতকের ফ্রান্স আত্মসাৎ করলো এবং ফরাসী গদ্যের জয়যাত্রা সূচিত হলো।[১৯] এদিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে বাংলা গদ্য পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের গদ্য হতে পিছিয়ে নেই। বরং উন্নতই বলা যেতে পারে। আর তখনকার দিনের বাংলা গদ্যের অন্যতম আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো সহজ, সরল ও ঐক্য সমন্বিত।

সাহিত্যের যাত্রা সব দেশেই পদ্য তথা ছন্দের মাধ্যমে। আর কবিতায় সব সময়ই মানুষ একটা অলৌকিক সত্তার ইঙ্গিত খুঁজে পেতো। ফলে প্রাচীন যুগে গদ্যের চেয়ে কবিতায় কিছু বলার প্রবণতাই বেশী ছিলো। আর পদ্য ও কবিতা যেমন একদিনে পরিণত রূপ লাভ করে নি—তেমনি গদ্যকেও প্রাথমিক স্তরের গদ্যরূপ লাভ করতে সময় লেগেছে—এ সত্যটি মেনে নিলে প্রাচীন ও মধ্যযুগে গদ্যের চর্চা ছিলোনা একথা আর বলা যায় না।

পণ্ডিতজনেরা চম্পুগদ্য ও দেহকড়চার গদ্যকে যদিও বলেছেন "দেহ-কড়চের প্রশ্নোত্তরময় ছোট ছোট বাক্য সমষ্টিকে সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে"।[২০] কিন্তু আমরা বলবো পাখীর বাচ্চা যেমন ডিমের খোলস থেকে বের হয়ে গেলেও তার গায়ে ডিমের রেশ ও গন্ধ থেকে যায় তেমনি প্রাথমিক স্তরের গদ্য এবং পুরোনো বাংলা গদ্য অনেকক্ষেত্রেই পয়ারের আমেজ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবে একথাও স্মরণযোগ্য যে, এই প্রথম স্তরের গদ্য একবারে অবিন্যস্ত ও জটিল নয়—সহজ, সরল, স্বচ্ছ, ভাব প্রকাশক ও ভাবব্যঞ্জক। আমরা এ গদ্যের কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

> কোনমাসে কোন রাসি। চৈত্রমাসে মীন রাসি।
> হে কালীন্দি জল বার ভাই বার আদিও। হস্ত
> পাতিলহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি। সেবক হব
> সুখি আমনি ধামাৎ কঞি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা
> দান পতি। সাংসুর ভোক্তা আমনি। সন্ন্যাসী

গতি জাইতি গাএন বাএণ দুআরি দুআর পাল
ভাণ্ডারী ভাণ্ডার পাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে
সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতার
দান পতির বিঘ্ন জাব নাস। কোনমাসে কোন রাসি।
বৈশাখ মাস মেষ রাসি। হে বসুদেব বার ভাই বার
আদিও হাথ সাতি লহ সেবকর পুষ্পপানি।
সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎ কন্নি।...[২১]

ডক্টর আনিসুজ্জামান এ গদ্য সম্বন্ধে বলেছেন—এ অংশকে গদ্য বলতে আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু একে পদ্যও বলা যাবেনা। এতে ছন্দের একটা দোলা আছে নিঃসন্দেহে কিন্তু তার ধারাবাহিকতা নেই। বোঝা যায় আমরা এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যেখানে পদ্যের কাঠামো ভেঙে গেলেও তার রেশ বয়ে যচ্ছে, আর গদ্যের কাঠামো গড়ে না উঠলেও তার আভাস সূচিত হচ্ছে।'[২২]

ডক্টর আনিসুজ্জামান এ-ধরনের আরো একটি উদাহরণ দিয়েছেন—

পশ্চিম দুআরে পরভু দিলা দরশন।
পশ্চিম দুআরে চন্দ্র পাহরীকে পাড়িল হুঁকার।
আস বাছা চন্দ্র পহরি বাটাল তাম্বুল খাব
রূপার বাঞ্চিত ঘাটে নির্মাণ করি দিব।[২২ক]

এবার আরো কিছু উদাহরণ দেয়া যাক—

প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দ গুণ গন্ধ গুণ
রূপ গুণ—রস গুণ স্পর্শ গুণ এই পাঁচ গুণ।
এই পাঁচ গুণ শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে।...
পূর্ব রাগের মূল দুই হটাৎ শ্রবণ অকস্মাৎ শ্রবণ।[২৩]

এই পঞ্চগুণ হইতে প্রেম বৃক্ষ হইল। সেই সে রাধিকার
রূপ। সেই বৃক্ষে দুই শাখা নিকসিল। সে কে কে।
এক সখীভাব আর শাখা বিভাব। ক্রমে দক্ষিণ বাস জানিবেন।
দর্শন আনন্দ মহাভাব দক্ষিণে। বিচ্ছেদ স্পর্শন বাম শাখাতে
নিকসিল। এই দুই শাখাবৃক্ষ উজ্জ্বল হইল। তাহার
ফল দক্ষিণ শাখার ফল তার নাম মিলন।[২৩ক]

রবীন্দ্রনাথ এ গদ্য সম্বন্ধে বলেছেন—বাংলা ভাষার কাঁচা অবস্থার যেটা সবচেয়ে আমাদের চোখে পড়ে সে হচ্ছে ক্রিয়ার ব্যবহার সম্বন্ধে সঙ্কোচ। সদ্য-ডিম-ভাঙা পাখির বাচ্চার দেখা যায় ডানার ক্ষীণতা। ক্রিয়াপদের মধ্যেই থাকে ভাষার চলবার শক্তি। ক্রিয়াপদ ব্যবহার যদি পাকা হত, তাহলে উড়ে চলবার বদলে ভাষার এ রকম লাফ দিয়ে চলা সম্ভব হতনা। সেই সময়কেই বাংলা ভাষার পরিণতির যুগ বলবো যখন থেকে তার ক্রিয়াপদের যথোচিত প্রাচুর্য এবং বৈশিষ্ট্য ঘটেছে।[২৪]

শূন্য পুরাণ ও প্রথমদিকের গদ্যকে কেউ কেউ প্রহেলিকাও বলেছেন[২৫]। চর্যাপদের অর্থ ও ভাবার্থ দিয়ে যে সমস্যার জন্য এ অভিধা দেয়া হয়েছিলো এখানেও বোধহয় একই সমস্যা। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, "বাঙালী চিরকাল কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, বাকবিতণ্ডা এমনকি কলহ মারামারিতে গদ্য ব্যবহার করে আসছে, কেউ পত্র-পুটে ধরে রাখেনি, কোনো দেশেই কেউ বড়ো ধরে রখে না। কিন্তু এখানেই হচ্ছে বাংলা গদ্যের আসল ভিত্তি—বাঙালীর মুখের কথা।"[২৬]

'বাংলা গদ্যের আসল ভিত্তির' উপর গড়ে উঠা এবার আমরা কিছু সাহিত্যিক গদ্যের উদাহরণ দেবো। বাঙালীর হাতে গড়ে উঠা এ সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের একটা নিজস্ব বাকরীতি, সহজ সরল চঙ একটা মৌল-ধারা ছিলো। বাংলা গদ্যের এ মৌল ধারায় কোনো বিদেশী শব্দ নেই এবং শব্দ বিন্যাস ও ভাব প্রকাশেও কোনো জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা নেই।—

১ শ্রীপঞ্চমিকে তিনদিন থাকিতে (শ্রীমতি) বাপের বাড়ী যানঃ॥ মাঘ ফাল্গুণ চৈত্রের ফুলদোল পর্যন্ত বাপের ঘরে থাকিয়া হুলি খেলা খেলেন। জতদিন হুলি খেলা তত [তত] দিন গোচারণ নাঞিঃ॥ হোলি-খেলার ছলে মধ্যাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ মিলনঃ॥ বৈসাখ মাষে সসুর ঘরকে আইসেনঃ॥ বৈশাখ জৈষ্ঠ আসাড়ের সতাইশ দিন পর্যন্ত ঘরে থাকিয়া আরবার বাপের ঘরকে আইসেনঃ॥ আসাড়ের তিনদিন থাকিতে শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত থাকেনঃ॥ বাপের ঘরে থাকিয়া হিন্দোলা ঝুলে লীলা করেনঃ॥ আর বার আশ্বিনের পাঁচদিন থাকিতে জাবটে আইষেনঃ॥ কার্তিক অঘ্রায়ণ পৌষ মাঘের শ্রীমঞ্চমি পর্য্যন্ত থাকেনঃ॥ (কারিকা)

—এ গদ্য শুধু বর্ণনা নয়—ব্যক্তি হৃদয়ের রং-এও অভিষিক্ত। অর্থ-বোধ ও প্রকাশ ক্ষমতায় এবং ভাবের অনভূতিতে এ গদ্য একান্তভাবেই সাহিত্যিক গদ্য।

২ সেই প্রেমের তরু শ্রীমতি॥ বৃক্ষের উপর দুই শাখা নিকসিল। এক শাখা ভাব আর শাখা মহাভাব হয়। দুই শাখাতে দুই ডগা নিকসিল। বাম শাখাতে ডগা নিকসিল তার নাম মিলা। দক্ষিণ শাখাতে ডগা নিকসিল নাম অমিলা। মিলাতে আনন্দ ফল সম্ভোগ। অমিলাতে বিচ্ছেদ ফল বিপ্রলম্ভ নাম॥ দুই ডগাতে পত্র নিকসিল। আনন্দ আর মদন। মিলাতে আনন্দ। অমিলাতে মদন। মিলাতে মঞ্জরি নিকসিল আনন্দের গুণ। অমিলাতে মঞ্জরি নিকসিল মদনের গুণ। তাহাতে পুষ্প বিকসিত হইল কন্দর্পের পাঁচবান।

এ গদ্য সম্বন্ধে ডক্টর আনিসুজ্জমানের উক্তি—'একই শব্দ ও ক্রিয়াপদের পুনরুক্তিতে হয়তো একটু একঘেয়েমী আছে কিন্তু এই ছোট ছোট অপূর্ণ বাক্যে যে ছন্দস্পন্দ আছে, তা গদ্য ধর্মকে ব্যাহত করেনি বরঞ্চ প্রসাদ-গুণ সৃষ্টি করেছে।'[২৭]

বজ্রকারিকা হতে আর একটি উদাহরণ দেয়া যাক—

> এই পঞ্চগুণ হইতে প্রেমবৃক্ষ হৈল। সেই সে রাধিকার রূপ। সেই বৃক্ষে দুই শাখা নিকসিল। সে কে কে। এক সখীভাব আর শাখা বিভাব। ক্রমে দক্ষিণ বাম জানিবেন। দর্শন আনন্দ মহাভাব দক্ষিণে। বিচ্ছেদ স্পর্শন বামশাখাতে নিকসিল। এই দুই শাখাবৃত্ত উজ্জ্বল হইল। তাহার ফল দক্ষিণ শাখার ফল তার নাম মিলন।

পণ্ডিতজনেরা এ-গদ্যকে কোনো সাহিত্যিক গদ্য বলতে নারাজ এবং অর্থবোধক ও ভাবপ্রকাশক গদ্য না বলে সন্ধ্যাভাষা বা প্রহেলিকা বলেন তা বুঝা যায় না। এখানে 'ভাষা পরিচ্ছদ' হতে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

> গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম

উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্যগুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।

আর এ-গদ্য সম্বন্ধেই সজনীকান্ত দাস মন্তব্য করেছেন—অনেকগুলি নমুনা হইতে সন্দেহ হয়, সেগুলি গদ্য নয়, গুহ্যসাধন সম্পর্কিত (সন্ধ্যা-ভাষায়) কতকগুলি ইঙ্গিত মাত্র। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দের মতে এগুলি বাংলা গদ্যের সূত্রপাতের যুগের নমুনা। আমাদের মনে হয়, তৎকাল-প্রচলিত কথা গদ্য ভাষার সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। এগুলি সন্ধানী লোকের পরস্পর জ্ঞানিত ইঙ্গিত—পরবর্তীকালের বহু সহজিয়া পুথিতে এই ভাষারই ক্রমপরিণতি লক্ষিত হয়। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পাশাপাশি বসানো এই সকল দুর্বোধ্য শব্দ লইয়া আলোচনা সমীচীন হইবে না।[২৮] এবার বৈষ্ণব কড়চা হতে আরো একটি উদাহরণ—

রাধাকুঞ্জের উত্তরে ললিতা জিউর কুঞ্জ। তার অষ্টদিগে অষ্ট সখির কুঞ্জ। মধ্যে এক কুঞ্জ নাম কন্দর্প কুহলি। তার মধ্যে চম্পক-বৃক্ষ আছে নানা রত্নের মূল বান্ধা। তার ছয় কোণ বেদিঃ উপরে চান্দয়া নানা জাতি রত্নে জড়িত বস্ত্রে ঝলমল করে। নানা পুষ্পগুচ্ছ তাহাতে দুলিতেছে। মধ্যে রত্ন পালঙ্কঃ নানা পুষ্প সর্য্যাতে বিরচিত। তার চতুর্দিগে নানা সামগ্ পরিপূর্ব। তার মধ্যে কিসোর কিসোরীকে বৈসাইঞা নানা সেবা নর্ম্ম সখিগণ করেন।

এবার আমরা এমন এক শ্রেণীর গদ্যের উদাহরণ দেবো যে-গুলো একান্ত ভাবেই সাহিত্য গুণ-সমন্বিত তথা শিল্পগুণ সমন্বিত গদ্য।—

এক পাত্রের দ্রব্য আর পাত্রে পড়িলে দ্রব্য মারা যায়। তস্য দিষ্টান্তনে গোমূত্রের এক ভাণ্ড দুগ্ধার এক ভাণ্ড। গোমূত্রে জাইয়া দুগ্ধা পড়িলে দুগ্ধা মাথি জায়। ভাণ্ডে ২ লাগলে দোস নাঞি হয়। অতএব বৈধিভক্ত জদি সাধুসঙ্গে করে তবে রাগানুগা সাধন বৈষম্য হয়। মর্যাদা মার্গে করিলে সাধুকে স্পর্শে না।

প্রকাশভঙ্গিতে নিজস্ব ঢঙ্ ব্যক্তি হৃদয়ের স্পর্শে ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে নিম্নের গদ্যাংশ। এ গদ্যের উপর অপূর্ণতার অভিযোগ থাকার কথা নয়—

পাঁচ বৎসর পর্যন্ত্য কৌমার বলি। দশ বৎসর পর্যন্ত্য গৌগণ্ড বলি॥ সাড়ে পনর বৎসর পর্যন্ত্য কৈসোর বলি। ইহার উর্দ্ধে যৌবন বলি। এ নাএক ছেয়ানৈ প্রকার॥ তাহাতে চারি প্রধান। ধিরোদাত্ত॥ ১॥ ধিরোললিত। ২॥ ধিরোদ্ধত। ৩॥ ধিরোসান্ত ৪॥ অথ নাই কার বয় সন্ধি। বাল্য জার যৈবন আরম্ভ বয় সন্ধি কহি॥ কিছু স্তন উঠে কিছু চঞ্চল দৃষ্টি হয় অপ্ন হাস্য হয় তাহাকে নব যৌবন বলি॥ কিন্তু মুগ্ধা॥ ব্যক্ত স্তন সুবলিত হন অঙ্গ উজ্জ্বল হন তাহাকে ব্যক্ত যৌবন বলি॥ ২॥ কিন্তু মধ্য পুষ্ট নিতম্ব ক্ষিণ মাজা অঙ্গে য্যোতি থাকে স্তন পুট আর বাঢ়েনা কদলি জিনিঞা উরুদেশ তাহাকে পুর্ন্ন যৌবন বলি। কিন্তু প্রগলভা॥ অধিরা ধিরা ধীরা ধীরা বলি। অসমা সমা সমাসমা বলি॥ (রসসিন্ধু)

অতপর সহমরণ অনুসরণের ব্যবস্থা॥ ইহাতে পতিকে আলিঙ্গন করিয়া সে স্ত্রী অগ্নি প্রবেশ করে তাহাকে সহমৃতা ব্যবহার হয়। অপর দুই চারি দিবস ব্যাতিরেকে কিম্বা অশৌচান্তে পাদুকাদি লইয়া যে স্ত্রী অগ্নি প্রবেশ করে তাহাকে অনুমৃতা ব্যবহার হয় তাহাতে সহমৃতা স্ত্রীর ত্রিরাত্রাশৌচ হয় তথাপি স্বামীর অশৌচের তুল্যকাল অশৌচ হয়। স্বামীর পিণ্ডের তুল্যকাল পিণ্ডদিবেক। অনুমৃতার বিশেষঃ। স্বমীর অশৌচের মধ্যে যদি অনুসরণ করে সেই দিবস হইতে তিন দিবসের মধ্যে পুরক পিণ্ড দিবেক। পরন্ত স্বামীর অশৌচান্তকালে স্বামীর শ্রাদ্ধান্তে সময়ে শ্রাদ্ধাদি সমস্ত করিবেক। (স্মৃতিকল্পদ্রুম)

বৃন্দাবনলীলার গদ্যরীতি সরল, স্বচ্ছ—এ গদ্য একান্তভাবেই সাহিত্যিক গদ্য—এ গদ্য পরিণত গদ্য। কোথাও জড়তা ও আড়ষ্টতা নেই—একটা স্বাচ্ছন্দ্য ও চলার গতি এখানে মুখর।—

শ্রী শ্রী বৃন্দাবনের দক্ষিণে তিন ক্রোষ মথুরা। মথুরার উত্তরে জমুনাদির পশ্চীমধারে অক্রুর ঘাট। কংশের আদেশে নন্দীপুর হইতে কৃষ্ণ বলরামকে মথুরায় আনিতে জে ঘাটে কৃষ্ণ বলরামকে ডাঙ্গায় রথে রাখিয়া অক্রুর স্নান করিয়া ছিলেন তাহাতে অক্রুর ঠাকুর যখন স্নান করেন তখন ডুব দেওনের কালে জলের ভিতর বথস্থ কৃষ্ণ বলরামকে দেখিলেন বিস্ময় হইয়া মস্তক তুলিয়া ডাঙ্গায় দৃষ্টি করিয়া দেখেন

পূর্বমত ডাঙ্গায় রথ আরোহণ করিয়া আছেন। পুনঃ পুনঃ কয়েকবার দেখিলেন যা বুঝিলেন নিরস্ত হইলেন। সে ঘাটের পাশ্চীমে অক্রুর ঠাকুরের একখানি গ্রাম আছেন তাহাতে এক সেবা আছেন। তাহার দক্ষিণে মথুরা সহর মধ্যে বিশ্রান্ত ঘাট। কৃষ্ণ বলরাম রথ হইতে নামিয়া সেই ঘাটে বসিয়া ছিলেন। জমুনাজীর জল পান করিয়াছিলেন। পূর্বদিগে শূর্য্য ঘাট, সেখানে বান রাজা তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে ধ্রুবঘাট, সেখানে ধ্রুব ঠাকুর পঞ্চ বৎসর কালে তপস্যা করিয়াছিলেন আর ২ চকিমঘাট আছেন মথুরার মধ্যখানে। সেখানে কেসোরায়জীর মন্দির মথুরার পশ্চীম দিগে কারাগার জেখানে বাসুদেব দৈবকী নিগুড় বন্ধনে ছিলেন সেখানে দৈবকী ঠাকুরাণী প্রসব হইয়াছিলেন সে স্থান অদ্যাবধি প্রকট আছেন।—

এবার আমরা উল্লেখ করবো অজ্ঞাতনামা লেখকের 'মহারাজা বিক্রমাদিত্য' সম্পর্কিত গল্পটি। চলিত ভাষায় অনায়াসে গল্প বলার ঢঙটি এখানে সুন্দরভাব ফুটে উঠেছে।

শ্রীশ্রী দুর্গা ঃ স্বহায়

মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র সা' অবন্তিকে

মোঁ ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম/শ্রীমতি মৌনাবতি সোড়ষ বরিষ্যা বড় সুন্দরী মুখ চন্দ্রতুল্য। কেষ মেঘের রঙ্গ আকর্ম্ম পর্য্যন্ত যুজ্য ভ্রর ধনুকের/নেয়ায় ওঠ রক্তিমে বর্ন হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাড়িম্ব/ফল রুপ-লাবণ্য বিদ্যুৎ ছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন সুন্দরি। সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পণ করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব। একথা/ভোজরাজা সুনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক/এক ২ রাজার পুত্রকে এক ২ দীন রাত্রের মধ্যে এক ২ জোনকে সয়ন/ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকেনা কেবল/কন্যা ঃ আর রাজপুত্র একখাটে কন্যা সোয়ে ঃ এক খাটে রাজপুত্র/সোয়ে। জে রাজপুত্র জেমন জেমন জ্ঞানবান হয়। সে ঃ সেইরূপ কথা/সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পারে না ঃ সকালে উঠেঃ/রাজপুত্র ঃ ঘরে জায়। এইরূপ প্রকারে কত ২ রাজপুত্র আইলো/কেহ

কথা কহাইতে পারিলেক না ঃ কতমৎ প্রকার করিলেক/তবু ঃ কন্যাকে ঃ কথা কহাইতে পারিলেক না। এইরূপে অনেক/দীন গেল ঃ পরে রাজা বিক্রমাদিত্য ঃ কন্যার ঃ রুপগুণ ষুনে/বড়ই তুষ্ট ঃ হইলেন ঃ কাহাকেও ঃ কহিলেন না ঃ সঙ্গে এক জোন/মনস্য ঃ লইলেন নাঃ কেবল আপুনি একা ঃ বড় ঘোড়ায় আরোহণ/হইয়া ঃ সিকারের ঃ নাম করিয়া ঃ দুই চারি ঃ রোজের পরে ঃ মোকাম ঃ ভোজপুর···ঘরে গিয়াছে সেই পাইবেক ঃ কন্যা একথা ষুনিঞা কাপড়/ফেলিতে ঃ পারেন। না ঃ হাসিয়া উঠিলেন। কথা কহিলে ঃ রাজা কন্যার হাত ধরীয়া ঃ আপনার খাটে লইলেন ঃ সারা/রাত্র হাসী খুসি করিলেন। তার পর দীন ভোজরাজা কন্যার/ বিভাহ দীলেন রাজা বিক্রমাদীত্যের সঙ্গে।

আধুনিককালের উপযুক্ত ছেদচিহ্ন প্রয়োগে ও বানান বদলিয়ে সুকুমার সেন এ গদ্যের রূপ দিয়েছেন নিম্নরূপ—

মোকাম ভোজপুর। শ্রীযুত ভোজরাজা। তাহার কন্যা নাম শ্রীমতী মৌনবতী। ষোড়শ বরিস্যা। বড় সুন্দরী। মুখ চন্দ্রতুল্যা। কেশ মেঘের রঙ্গ। চক্ষু আকর্ণ পর্যন্ত। যুগ্ম ভুরু ধনুকের ন্যায়। ওষ্ঠ রক্তিমবর্ণ। হস্ত পথের মৃণাল। স্তন দাড়িম্ব ফল। রূপ লাবণ্য বিদ্যুৎ ছটা। তার তুলনা আর নাই—এমন সুন্দরী। সে কন্যার বিবাহ হয় নাই।

সুকুমার সেন বলেছেন এ ভাষায় 'পশ্চিম অথবা উত্তর বর্ধমানের উপভাষার ছাপ আছে।' এর ভাষাকে কেউ পনর শতক, কেউ ষোড়শ, কেউ সপ্তদশ শতকের ভাষা বলে অনুমান করেছেন। চলতি ভাষায় বাংলা গল্পবলার ঢঙটি এখানে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

এ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের যে রীতিটি আমাদের কাছে ধরা পড়েছে তা একান্ত ভাবেই সহজ, সরল ও স্বতস্ফূর্ত। এখানে কোনো কৃত্রিম প্রয়াস নেই—ভাষার সাথে প্রাণের একটা সম্পর্ক রয়েছে। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য, এ গদ্যরীতিতে কোনো বিদেশী শব্দ ও বিদেশী গদ্যরীতির প্রভাব নেই। এ-সব গদ্য বাঙালীর হাতের বিশুদ্ধ বাংলা গদ্য।

এবার আমরা কিছু সরকারী ও ব্যক্তিগত চিঠি-পত্রের উল্লেখ করবো। এসব চিঠি পত্রে বাংলা গদ্যরীতির দু'টি ধারার সাথে পরিচিত হবো।

একটি ধারা বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যরীতি অপর ধারায় আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ যা পরবর্তীকালে যাবনী-মিশালের প্রাচুর্যে বাংলা গদ্য-রীতিতে এক চরম বিপর্যয় এনেছে।

জহরলাল বসু তাঁর 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে' পুরোনো বাংলা গদ্যের নমুনা স্বরূপ তারকেশ্বর মোহন্তের মামলার আপিলের রেকর্ড হতে যে নিদর্শন তুলে ধরেছেন—তা প্রমাণিত হয়। পত্রটির তারিখ 'সন ৭৮৫ সাল' এর ১০ই চৈত্র। পত্রটির তারিখ এতো প্রাচীন হতে পারেনা। পত্রটি এখানে তুলে ধরা হলো—

ঁশ্রীশ্রী রঙ্গ

স্বস্তি সকল মঙ্গলময় শ্রীশ্রী তাঁরেকশ্বর ঠাকুর চরণ যুগলেষু—দেবত্তর জমি পত্রহ সিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃগ্রাম জোত সমস, ভণ্ডপুর, নাগাদী সাহাপুর—এই সকল গ্রামসেবার কারণ—জমি শালীণ্ডনা হর্দ্দ মহদুদ ঘোড় দৌড় জত জোত করিতে পারে তাহা জোত করিবে—সেবাত শ্রীযুক্ত মায়াগিরি ধূম্রপ্রাণ মোহন্তীতে নিযুক্ত থাকিয়া জুতিয়া যোতায়া শ্রীশ্রী ৺সেবা করহ এ সকল জমির রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি ইতি সন ৭৮৫ সাল১০ই চৈত্র।

শ্রীরাজা ভারামল্ল রায়

১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে কোচ বিহাররাজ প্রাণনারায়ন-এর অহোমরাজ স্বর্গ-নারায়ণকে লেখা চিঠি—

লেখ নং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অথন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বদ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি। তোমারো এ গোট কর্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিস। সতানন্দ কর্ম্মী, রামেশ্বর শর্মা, কালকেতু ও ধুমা সর্দার

উত্তগু চাউমিয়া শ্যাম রাই ইমরাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি২ ধুনু ১ চেঙ্গস মৎস্য ১ জোর বালিচ১ জকাই ১ সারি ৫ খানা এই সকল দিয়া গেছে। আর সমাচার বুজি কহি পাঠাই-বেক। তোমার অর্থে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিট ৫ বাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ৪৭৭ মাস আষাঢ়

১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে জয়ন্তীয়ারাজ অহোমরাজের কাছে যে চিঠি লিখেন তা এখানে তুলে ধরা হলো।—

পরম সৌহার্দ- লিখনং-কার্যঞ্চ আগে। এথা কুশল, তোমার রাজোন্নতি কুশল-মঙ্গল সদা বাঞ্ছি। পরং তোমার লিখা পত্র আসি পহুছিল।

সমাচার পরম প্রীতে জানিলাম আর তোমার কটকীর প্রমুখ্যে বার্তা শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম।

এবার একটি ব্যক্তিগত পত্র তুলে ধরছি—

তোমার বাড়ীর আমার বাড়ীর সংবাদ বিবরিয়া লেখিবেন আর ঘরের বিষয় সকল সৌষ্ঠব করিআ থাকিবেন আমার এখানে কিছুমাত্র নাই বাসা খরচ হয় না কজ্জতে সদাব এই শ্রীমতি দাদী ঠাকুরাণীর স্থানে সাতটি টাকা লইয়া দেবে বাড়া নাগে তাহা করিবেন অবস্য অবস্য রামহরি দিগের টাকা দিবে নাই রাম হরিদ্দের খাবার খরচ উশাড়ি গ্রামে চালু ১৯ সাল ১০ সাড়ে শ্রীবিশ্বনাথ আচার্য্য স্থানে আছে শ্রীরামনাথ শর্ম্মাকে লইয়া আসিবেন শ্রাবণ নাগাদি অগ্রহায়ণ পর্যঞ্চ হইবেক আমার এখানে নাই যে যাবেন। পুনশ্চ লিখি গোয়ালন্দের ঔষধ দুই সপ্তাহ চতুর্মুখ পাঠাই মধুতে ঘসিয়া পিপ্পলী চুর্ন প্রক্ষেপ দিয়া খাইতে কহিবেন।

আর একটি ব্যক্তিগত পত্র—

দিবস কএক হইল পত্রাদী কোন সমাচার পাই নাঞী তাহাতেই ভাবিত আছি বিবরিয়া কুশলাদি লিখিয়া প্যাইত করিবে অপর আমার পরিধিয় বস্ত্র নাঞী ইহার সঙ্গতি করিয়া তুমি পাঠাইবা আমার বাটীর খরচের

অপ্রতুল তাহা লিখীয়া কি জানাইব জে সুরাতে কিঞ্চীত খরচ পাঠাইতে পার তাহা মনজোগ করিয়া পাঠাইবে জেয়াদা কি লিখীব ইহা জ্ঞাত করিলাম ইতি সন ১১৮৮ সাল তারিখ ১ বৈসাখ রবিবার সময় উর্ধ্ব কাল।

অন্য আরো একটি ব্যক্তিগত পত্র—

৭ শ্রীশ্রী রামঃ

ত্বদিয় শ্রী যুগলকীসোর শর্ম্মণ পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ। আদৌ তোমার মঙ্গলেই অত্র মঙ্গল হয় বিসেষ আপনারা এখানকে আশীয়া ছিলেন তাহাতে আমার সরির অপ্রতুল হইল দেখিয়া গিয়াছেন এইজন্য জাইতে না পারিলাভ অতয়েব শ্রীবক্রেশ্বর শর্ম্মাকে পাঠাইয়া করণ কর্ত্তব্য থাকে ঞিহাকে ৫ পাচ তঙ্কা দিয়া বিদায় করিবেন আমিহ পশ্চাত জাইয়া সকল সমাধা কিরিয়া দিব ইহার কোন সন্দেহ না করিবেন জ্ঞাত করিল—ইতি সন ১০৬৯ শা-তা ১৭ বৈশাখ।

এবার একটি আত্মবিক্রয় পত্রের উল্লেখ করবো—

আমরা সপরিবরে অন্নরিন উপহতি ক্রেসে নগদ মূল্য তোমার স্থানে ১১ এগার রূপাইয়া পাইয়া স্বইচ্ছা পূর্বক আপ্ত বিক্রি হইলাম। তোমার পুত্র পৌত্র আদি ক্রেমে আমার পুত্র পৌত্র আদি ক্রেমে গোলামি করিব এহি করারে আপ্ত বিক্রয় পত্র দিলাম ইতি সন ১১৩৪ চৌত্রিশ তেরিখ ১৬ ফালগুন।

বিপন্ন অবস্থায় পতিত মহারাজ নন্দকুমার পুত্র গুরুদাসকে লেখা চিঠিটি বাংলা গদ্যসাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। পত্রটি ১১৭৮ সালে (১৭৭১ খ্রী.) ২৯ পৌষে লেখা—

প্রাণপ্রতিমেষু পরম শুভাশীর্বাদ শিবঞ্চ বিশেষ ঃ—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল পরন্তঃ ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত ফেতরত আলি খাঁ এর এখানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণতক পাঁহুছেন নাই পঁহুছিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষরোজের পর

বাটি হইতে আসিয়াছেন যেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানই গেল তিনি যথা যথা যাউন ফলত কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন সুষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেন।

এ পর্যন্ত আমরা বাংলা গদ্যের যে সমস্ত নিদর্শন তুলে ধরেছি—তা একান্তভাবেই নিখাদ বাংলা গদ্য। এবং এখানে বাংলা ভাষার মৌল ভিত্তি ও নিজস্বরীতি রয়েছে যেখানে কোনো বিপর্যয় ও অন্য ভাষার কোনো প্রভাব নেই। কোনো কষ্টক্লিষ্ট ভাব ও জড়তা এবং আড়ষ্টতাও নেই। সহজ, সরল, স্বচ্ছ, ভাববোধক ও ঐক্য সমন্বিত এ গদ্য। এ গদ্যের সাথে বাংলা ভাষার প্রাণের ও নাড়ীর গভীর নিবিড় বন্ধন। শুধু বিদেশী ভাষার স্টাইল কেনো বিদেশী কেনো শব্দও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "বিষয়ানুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।"[২৯] উপরে আমরা যে সমস্ত পুরানো গদ্যের উদাহরণ দিয়েছি—সেগুলো বিষয়ানুসারেই রচিত। অর্থাৎ শূন্য পুরানের গদ্য, সেক শুভোদায়ার গদ্য, কারিকার গদ্য, দেহ কড়চার গদ্য, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও সরকারী চিঠিপত্রের গদ্য এক নয়। বিষয়ানুসারেই ভিন্নতর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আনিসুজ্জামানের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

বাংলা গদ্যের এই যে প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি, এতেই তার স্বাভাবিক প্রবাহের রূপ দেখা যায় বলে মনে করি। তবে বিষয় ভেদে এই প্রাঞ্জলতার হেরফের হয়েছে, সে কথাও স্বীকার্য। যেমন 'ভাষা পরিচ্ছেদে'। আপাতদৃষ্টিতে এর গদ্যও সরল কিন্তু যেখানে লেখক ন্যায়ের তত্ত্ব কথায় প্রবেশ করেছেন, সেখানে ভাষার একটু জটিলতা এসেছে, অন্ততঃ অনধিকারীর পক্ষে তা দুরূহ মনে হতে পারে। আবার কবিরাজী বা জ্যোতিষের পুথি সহজপাঠ্য, কিন্তু তাতে লালিত্য নেই। লালিত্যহীন হলেও অনেক দলিল-দস্তাবেজ প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা।[৩০]

তাই দেখা যায় পোর্তুগীজ পাদরী, ইংরেজ ও ফোর্ট উলিয়াম কলেজের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের গদ্য ছাড়াই অর্থবোধক, অভিব্যক্তিময় প্রাঞ্জল, স্বচ্ছ ও ঐক্য সমন্বিত শিল্পিত বাংলা গদ্য ছিলো—যে গদ্য ছিলো বাংলা ভাষার মৌলাভিত্তি। এ গদ্যকে অস্বীকার করে—বাঙালীর

মুখের ও প্রাণের এবং বাঙালীর কলমের গদ্যকে অস্বীকার করে পোর্তুগীজ পাদরী, ইংরেজ ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্যকে ভিত্তিহীন করে চরম বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এবার আমরা বাংলা গদ্যের আর এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবো।

## পাঁচ

এবার আমরা আলোচনা করে দেখবো পোর্তুগীজ পাদরী এবং ইসলামী শব্দের অযথা ব্যবহারে বাংলা গদ্যে কি কৃত্রিমতাও জটিলতা এসেছে। এখানে আরো দেখা যাবে যে, এসব গদ্য বাংলা গদ্যের মৌল ভিত্তিচ্যুত, এবং অনায়াস ও স্বতস্ফূর্ত স্টাইলও এখানে ব্যাহত হয়েছে—যে গদ্যের সাথে বাংলা গদ্যের নাড়ীর ও প্রাণের স্পন্দন ছিলোনা।

১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দ বাংলা গদ্যের বিপর্যয়ের এক কালোরেখা। এ বিপর্যয় এসেছে পোর্তুগীজ পাদরীদের গদ্যচর্চার মাধ্যমে। পোর্তুগীজ পাদরীরা ছিলো রোমান ক্যাথলিক। তারা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গীর্জা তৈরী করে এবং অসহায় হিন্দু মুসলমানদের জোর করে ধরে এনে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করতো। দেশীয় ভাষা না শিখলে যে এদেশে ধর্ম প্রচার সম্ভব নয় এ বোধ থেকেই তারা বাংলাভাষা চর্চায় তৎপর হন এবং দিন রাত পরিশ্রম করে বাংলা ভাষা শিখেন। কিন্তু বাংলা ভাষার মৌলধারাটি তারা আত্মসাৎ করতে পারেননি, তাই স্বভাষার বাকরীতি, ব্যাকরণ ও অভিধান অনুসারেই বাংলা গদ্য শিখেন এবং এ পদ্ধতিতেই ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে মনোএল দ্য আস্ সুম্পসাম বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ 'পোর্তুগীজ বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ' (Vocabulario Em Idioma Bengla' E Protuguez) রচনা করেন। 'পর্তোগীজ বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ' রোমান হরফে লিসবন শহরে মুদ্রিত হয়। পুর্তোগীজদের মধ্যে যারা বাংলা গদ্য চর্চায় স্মরণীয় এঁদের মধ্যে মনোএল দ্য আসসুম্পসাম ও দোম এন্তোনিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মনোএল-এর প্রথম গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (Caepar Xaxtrer Orthbhed) রোমান অক্ষরে ছাপা। গ্রন্থটি ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে পোর্তগালের লিসবন শহরে মুদ্রিত হয়। ঢাকার ভাওয়াল ও নাগরী

এলাকার কথ্য চঙ এর ভাষা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থে আঞ্চলিক, লৌকিক ও গ্রামীণ শব্দের আধিক্যে মনে হয় মনোএল সাহেব এ গ্রন্থ নিজে না লিখে নাগরী বা ভাওয়াল এলাকার কোনো দেশীয় খ্রীস্টানকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। গ্রন্থটি মনোএল সাহেবের নামে মুদ্রিত হলেও এ সন্দেহ আজও দূর হয়নি। 'মূল পোর্তগীস অংশ মনোএল এর লেখা, তিনি সম্ভবত কোনও দেশীয় খ্রীস্টানকে দিয়া বাংলা অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন।'[৩১] আমরা কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ-এর ভাষার কিছুটা নমুনা তুলে ধরছি---গুরুঃ অপূর্ব্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবেঃ আমি মালা জপিনা; তথাচ আন ধরণ ভজনা করি; জগি খ্রিস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজন করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গে যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।

শিষ্যঃ যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন। সকল যত ভজনা ভালো, কিন্তু বিনে ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি এবং ঠাকুরাণীর ভজনাবিনে আর যত ভজনায় বাহু মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরাণীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুকাই শোন।

আর একটা উদাহরণ দেয়া যাক---

হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিজ শহরে দুই গালিম পুরুষ শত্র আছিল : বিস্তর দিন তাহারা একজনে আর জনেরে তালাশ করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ। কন্টের দিন ছয় ঘড়ি দুই পহর বাদে তাহারা জনে জনেরে লাগাল পাইল; লাগাল পাইয়া দুই জনেও তরোয়াল খসিয়া মারামারি করিল। যেজনে বেশ তেজবন্ত সে আরো একচোট দিল সে মাটিতে পড়িল, পরাজয় হইল। পরাজয় হইয়া শত্রেরে মাফ চাহিয়া কহিল। ঠাকুর; পরাজয় হইয়াছি আমারে জিনিলা, আর কি চাহ? খ্রীস্তর লাগিয়া আমারে মাফ কর, তবে খ্রীস্ত তোমারে মাফ করিবেনঃ জিনিয়া কহিল। খ্রীস্তর লাগিয়া তোমারে মাফ করি, যেন তিনি আমারে মাফ করুক। পরে তাহারে উঠাইল রক্ত ও পোছাইল ঔষদ্য ও দিল, পরে দুইজন মিলিয়া বড় দোস্ত হইল। জিননিয়া ধর্মঘরে গেল। ধর্ম ঘরেতে স্তব করিল, স্তব করিয়া যে খ্রীস্তর আকৃতি আছিলেন, তাহানে সেবা করিতে গেল, আঙ্গু করিয়া খ্রীস্তর আকৃতির কাছে তাহান পদেতে চুমু দিল। তখন খ্রীস্তর আকৃতি এ আঠের খিল খসিয়া, তাহারে আলিঙ্গন দিলেন। এ

মহা অপূর্ব সে আপনে দেখিল এবং যত লোক ধর্মঘরে আ.ইল, সকলে ও দেখিল। জিননিয়া পরমেশ্বরের পূজা দিল। যতদিন বঞ্চিল অনেক পুণ্য করিল। বির্ধকালে পুণ্যে পূর্ণিৎ মরিয়া চলিয়া গেল স্বর্গে।

মনোত্রল-এর এ গদ্যে বাংলা গদ্যের যে কিভাবে বিপর্যয় ঘটেছে এর সাক্ষ্য আমার পাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিতে----

যে বাঙালা ঐ পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক বাঙালা। দুইশত বৎসর পূর্বে ঢাকা জেলায় ভাওয়াল অঞ্চলে ব্যবহৃত বাঙালা। এই ভাষা কিন্তু একেবারে মৌখিক ভাষা নহে। সাহিত্যিক ভাষার উপরেও ইহা অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত। এ গ্রন্থে ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চলের অনেক আঞ্চলিক শব্দ আছে তা একান্ত সত্য। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা কথ্যও নয় আবার সাহিত্যের ভাষাও নয়। ভাষার মূল ধারাকে বিকৃত করে এক নতুন রীতি---মনোএল সাহেব একেই হয়তো বাংলা গদ্যের আদর্শরীতি বলে মনে করেছিলেন এবং এই ধারণা হতেই প্রকৃত পক্ষে তার হাতে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিকত্বের বিপর্যয় ঘটে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এর শুধুমাত্র আঞ্চলিক শব্দ দেখে অনেকে একে মোনএল-এর রচনা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন---একটিমাত্র কারণে এ সন্দেহ পর্বত প্রমাণ হয়ে বলবৎ থাকলে এ ধারণাও সমীচীন বলে মনে হয়না। প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থের বাংলা বাকরীতি দেখে মনে হয় না যে এ বাঙালীর হাতের গদ্য---আর বাঙালীর হাতের হলে শব্দ ও বাক্য গঠনে এমন বিপর্যয় ঘটারও সম্ভাবনা থাকতোনা।[৩২]

মনোএল সাহেব পর্তুগীজ বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিলেও তাঁর রচিত গদ্যে পর্তুগীজ ভাষার বাক-রীতি ও পদ বিন্যাসই রয়ে গেছে, যেখানে বাংলা ভাষার প্রাণস্পন্দন নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তা জটিল ও আড়ষ্ট হয়ে ভাব প্রকাশের অন্তরায় হয়েছে এবং স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়েছে।

পর্তুগীজদের মধ্যে যাঁরা বাংলা গদ্যের চর্চা করেছেন এঁদের প্রধান হলেন দোম এন্তোনিও। দোম এন্তোনিও রোজারিও তার আসল নাম নয়---এবং আসল নাম জানাও যায়নি। কথিত আছে তিনি ঢাকার ভূষণার জমিদার পুত্র। পোর্তুগীজ জলদস্যুরা শিশুকালে তাকে অপহরণ করে, পরে

টাকার বিনিময়ে পাদরীরা কিনে নেয়। এবং পরবর্তীকালে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারক হন। এদেশে ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের মানসেই তিনি বাংলা গদ্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' ও 'রামায়ণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সার'। কারো কারো ধারণা কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদের মতোই 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত হয়। তবে বইটির কোনো মুদ্রিত কপি পাওয়া যায়নি---যদিও লিসবনে মূল পাণ্ডুলিপি আজও রক্ষিত আছে।

মনোএল এর ভাষার তুলনায় দোম এন্তোনিওর ভাষা অনেকটা স্বচ্ছ ও আড়ষ্টতামুক্ত। কিন্তু তাঁর হাতেও বাংলা গদ্য বিপর্যয় হতে রেহাই পায়নি—

১ যদি পরমার্থে জিগাসো তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তা চিতে কদাচিতো লএনাযে পরমেশ্বর এমত করেন; কিন্তু সাস্ত্রে কহে যে একথা যেতো কালের পাপে করমাঙ্কিতে লওয়াএ। (ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ)।

২ রামের এক স্ত্রী তাহান নাম সীতা আর দুই পুত্র লব আর কুশ। তাহান ভাই লকণ। রাজা অযোধ্যা বাপের সত্য পালিতে বন-বাসী হইয়াছিলেন। তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবন ধরিয়া নিয়াছিলেন, তাহার নাম সীতা। সেই স্ত্রীরে লঙ্কাৎ থাকিয়া আনিতে বিস্তর যুর্ধ করিলেন। বালিরে মারি তাহার স্ত্রী তারা সোনিবেরে দিলেন, সে বালির ভাই। তাহারে রাজখণ্ড দিলেন : বিস্তর রাখ্যসবধ করিলেন, কর্মকর্ণ বধিলেন, ইন্দ্রাজিৎ বধিলেন প্রসাতে (পশ্চাতে) রাবন বধিয়া সীতারে আনিলেন : রাবনে(র) স্ত্রীরে রাবণের ছোট ভাই বিবীষণেরে দিলেন, তাহার নাম মন্ধদরী, তাহারে রাম বর দিয়াছিলেন, কহিয়াছিলেন, তুমি জর্ম আইয়োস্ত্রী হও, এ কারণে বিবীষণের দিলাম, জামনি করিয়া রাবন বধ হইয়াছে, তাহারে আর জিয়াইতে না পারিলেন, তাহার অন্য ও সীতারে নীতে কহিলেন, তাহার পর সীতারে আনিয়া বিস্তর পরীখা দিলেন, যে রাবনে নি এহারে পরশ করিয়াছে। তাহাতে পরীখ্যাতে সীতা সাঞ্চা হইলেন, ততাচ রামে তাহানে প্রত্যয় নহিল, আর রামের দুই

পুত্র লব আর কুশ সঙ্গে রামের বিস্তর বিস্তর যুর্ধ করিলেন পুত্র না চিনিয়া শেষে মুনি সিয়া পরাজয় (=পরিচয়) করিয়া দিল, প্রাচাতে (=প্রশ্চাতে) সকল প্রখ (=প্রত্যয়) হইল, শেষ রাজখণ্ড অযোদ্যাতে করিতেন, প্রচাতে তাহান পরলোক হইল। তাহান আতুআঁ পরমেশরেতে মিশিল গিয়া। (রামায়ণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সার)।[৩৩]

পর্তুগীজদের বাংলা গদ্যচর্চা বিশেষত মনোএল সাহেবের গদ্যের সঙ্গে বাঙালীর হাতের বাংলা গদ্যের তুলনা করে এবং উল্লেখিত অজ্ঞাতনাম লেখকের গল্পটির উদ্ধৃতি দিয়ে ডক্টর আনিসুজ্জামান বলেছেন—

'''কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের তুলনা করি, তাহলেই বোঝা যাবে যে, বিদেশী লেখকদের হাতে বাংলা গদ্যের এই স্বাভাবিক গতিও প্রকৃতি কিভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলো। মনোএল-এর রচনা প্রশ্নোত্তরের ঢঙে রচিত কিন্তু দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি প্রায়ই দীর্ঘ আখ্যান সংযোজন করেছেন। কোনো কোনো উপাখ্যান পাঠযোগ্য, অন্তত তাঁর ধর্মগীতির তুলনায় অনেক সহনীয়। বাংলা ভাষার প্রকৃতির ওপর এ-গ্রন্থের যে পীড়ন করা হয়েছে উপভাষার কৌতুককর মিশ্রণ সত্ত্বেও তা ঢাকা পড়েনি।[৩৪]

**ছয়**

বঙ্গে মুসলিম আক্রমণ যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়েছে একথা স্পষ্ট করে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন।[৩৫] কিন্তু মুসলিম প্রভাবে আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগে বাংলা ভাষা বিশেষত বাংলা গদ্যের স্বাভাবিকত্বের যে বিপর্যয় ঘটেছে তাও একান্তভবে স্বীকার্য। মুসলমান রাজা-বাদশারা শুধু মাটির দখলকেই খাঁটি দখল মনে করতেন না বিজিতের হৃদয় দখলকেউ বড়ো মনে করতেন। তাই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণা তারা করেছেন এ নজীরের অভাব নেই। 'ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন, একথা সর্বজন বিদিত। তাই শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়, রাজ রাজড়ার চিঠিপত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে দলিল দস্তাবেজে বাংলার যথেষ্ট ব্যবহার ঘটেছিলো। সুলতানী আমলের সরকারী বাংলা চিঠির নমুনা আমরা উদ্ধার করতে পারিনি কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর একাধিক মুঘল শাসনকর্তা

স্বাক্ষরিত বাংলা চিঠি পাওয়া গেছে। এসব পত্রে সুলতানী আমলে প্রচলিত রীতির অনুবৃত্তিরই পরিচয় আছে, এমন মনে করা অযৌক্তিক নয়। মুরশিদকুলি খাঁর দরবারে বৈষ্ণব মতাদর্শঘটিত বিতর্ক-অনুষ্ঠানের পরিণামে নবাবের মোহর-অঙ্কিত বাংলায় দেখা জয়পত্রের অস্তিত্ব আছে।[৩৬]

মুসলিম রাজত্বের সমৃদ্ধির যুগে অফিস আদালত ও জনজীবনে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। মুসলমান রাজা-বাদশাদের ধর্মীয় ভাষা আরবী আর রাজভাষা ফারসী, এবং এদেশের মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। সরকারী চাকুরী ও কৃপালাভ এবং রাজ-তোষণের জন্যও অনেকের মধ্যে রাতারাতি আরবী-ফারসী শেখার একটা হুজুগ পড়ে যায়। আবার রাজভাষা ফারসী শিক্ষাকে অনেকে আভিজাত্যের পরিচয় বলেও মনে করতো। পরবর্তীকালে ইংরেজ রাজত্বের সময় ইংরেজী ভাষা নিয়ে যা ঘটেছিলো। সুতরাং মুসলিম রাজত্বের সমৃদ্ধির যুগেও আরবী-ফারসী পড়ার হিড়িক চরমে উঠেছিলো। ফলে বাংলা ভাষায় দ্রুত আরবী ফারসী শব্দের সংমিশ্রণ ঘটে। এতে বাংলা ভাষার বিশেষতঃ বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক ও মৌলধারার বিচ্যুতি ঘটে এবং জটিল ও আড়ষ্টতায় মোড় নেয়। সুদীর্ঘ মুসলিম শাসক ও ধর্মীয় আবহ এবং রাজভাষার পরিবেশগত কারণেই অনায়াসে বহু আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা ভাষায় একাত্ম হয়ে গেছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, 'যাবনী মিশাল' তখন একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ভারতচন্দ্রের উক্তি----

পড়িয়াছি যেই মতো লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

তাই দেখা যায় সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকেই সাহিত্য, চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ এবং অফিস আদালতে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার। কিন্তু মুসলমান রাজা বাদশারা জোর বা পীড়ন করেননি কাউকে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের জন্য। যদিও সজনীকান্ত দাস হ্যালহেড সাহেবের বরাত দিয়ে লিখেছেন—'মুসলমান-শাসনকর্তাদের

অত্যাচারে সকল ব্যাপারে ফারসী ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়াতে চলিত ভাষার শুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে এবং কেবলমাত্র অভ্যাসের দোষে বহু পারসী শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।[৩৭]

এ উক্তি যথার্থ সত্য বহন করেনা। কারণ তাহলে মুসলমান রাজা বাদশারা বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষণা করতেন না। সজনীকান্ত আরো লিখেছেন—'হ্যালহেড তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় আরো বলিয়াছেন যে, খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ দ্বারা অধুনা বাংলাদেশে ব্যবহৃত ভাষার সম্যক হালচাল উপলব্ধি সম্ভব নয়। যে বহু সংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা বাংলাদেশ পীড়িত হইয়াছে সেগুলি ভাষার সারল্যও নষ্ট করিয়াছে। এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন দেশবাসী ও পৃথক রীতি-নীতি সম্পন্ন লোকদের সহিত দীর্ঘ কালব্যাপী লেনদেনের ফলে বাঙালীর কানে বৈদেশিক শব্দ আর অপরিচিত ঠেকে না। মুসলমান, পোর্তগীজ ও ইংরেজ পর পর সকলই ধর্ম, আইন, কারুশিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু শব্দ বাংলা ভাষার কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছে।[৩৮] বস্তুত মুসলমান রাজা-বাদশারা জোর করে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের তাগিদ দিয়েছেন এমন কোন নজীর নেই। রাজ ভাষার দীর্ঘ দিনের প্রভাব এবং রাজতোষণের ফলেই তা হয়েছে।

এবার আমরা আরবী-ফারসী শব্দ সম্বলিত গদ্যের উদ্ধৃতিও আলোচনা করে দেখবো যে, বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক ও সরল রীতির কিভাবে বিপর্যয় ঘটেছে। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, প্রথমদিকে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার ছিলো অনায়াস যুক্ত। এতে বাংলা ভাষার স্বভাব ও সারল্য নষ্ট হয়নি। ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে গৌহাটির তৎকালীন ফৌজদার নবাব আলোয়ার খাঁকে লেখা কোনোও এক অসমীয়া রাজার লেখা চিঠি এখানে তুলে ধরছি। পত্রে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার থাকলেও তা অনায়াস ও স্বাভাবিক এবং ভাষা সহজবোধ্য ও শিল্পগুণ সমন্বিত।

স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব আলোয়ার খাঁ সদাশয়েষু

সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ। আগে এথা কুশল। তেমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্রহিত আসিয়া

আমার স্থান পঁহুছিল। আমিও প্রীতিপ্রণয়পূর্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমায় উত্তম পত্র আসিতে আমার কিঞ্চিত মনস্থিতা না রহে এ যে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহলাদ রূপে জানিতে আছ তোমার আমার অদ্বয়ভাব প্রীতি ঘাটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণে না হইবেক।[৩৯] কিন্তু ভাষাকে জোর করে ব্যবহারের ফলেই কৃত্রিমতা ও জটিলতা আসে। এবং ভাষা বিপর্যয়ের সম্মুখীনও হয় তখনই। এবার আমরা এ ধরনের কিছু গদ্যের নমুনা তুলে ধরবো। বাংলা অক্ষরে সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্য নিম্নের চিঠি—

'৭ শ্রীরাম—

গরিবনেওয়াজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগণে কাকজোল তাহার দুইগ্রাম দরিয়াশীকিশ্‌তি হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শতী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরে-কৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবণ।

ফিদবি
জগতধির রায়[৪০]

আরবী-পারসী শব্দের বহুল ও অযথা প্রয়োগে এ গদ্য যে কতো জটিল ও দুর্বোধ্য তা আর আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা।

এ ধরনের আর একটি পত্রের উল্লেখ করা যাক—

হকীকত মজুকুর শ্রীযুত জসোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালায়ত আছিল রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ সেবকেরা আপনার আপনার ওয়াদা মাফিক সেবা করিতে ছিল রাত্রিদিন চৌকী দিতেছিল শ্রীরামজীবন মৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুসানুক্রমে করিতেছেন। ইহার মৌধ্যে পরগণাতে পরগণাতে দেওড়াও সুরূত তোড়িবার আহাদে

হুজুর থাকিয়া পরোয়ানা লইয়া আর আর পরগণাতে দেওড়া ও মুরাত লাগীল। এ বার্ত্তা ষুনিয়া ঠাকুর রামজীবন মৌলিকের ও বাড়িতে বাহির বাড়ীতে আসিয়া রহিলা রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়বহ ঠাকুরের সেবা ও চৌকিপহরা রাত্রিদিন নিজুক্ত আছিল তাহার পর ২৭ মহররম মাহে ২৮ জৈষ্ঠ ঠাকুর দেখিবার প্রাতেঃকালে সকল লোকে গেল ঠাকুর সেখানে না দেখিল রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহতে সেবা করিতেছিল তারায় সেখানে নাই তদবধি রামজীবন মৌলিকের বাড়িতে ঠাকুর ও রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ কেহ নাহি। ইতি—স ১৭৭৯তে ২৯ মহরম মাহে।[৪১]

এ গদ্য শুধু জটিল ও দুর্বোধ্য নয়—বাংলা গদ্যের এখানে এক চরম বিপর্যয়। এবার আমরা কয়েকটি চিঠির উল্লেখ করবো এবং দেখবো যে, শুধু আরবী-ফারসী শব্দের আধিক্যই নয়—মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দেরও প্রয়োগ। বাংলা গদ্যের বিপর্যয়ে পুর্তোগীজ ও আরবী-ফারসী শব্দই নয় ইংরেজীর উৎপাতও শুরু হয়েছে।

১ স্বস্তি প্রতিরূদীয়মানার্ক মণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপ তাপিত সত্রু-সমূহ পুজিতা খীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুর ষুনতান ও ওইঙ্গলিস্থান জব্দয়েন বুনিয়ান আজীমঃশান শীপাহছালার আফুয়াজ বাদশাহী ও কম্পনী কেস ওয়ে হিন্দোস্থান গৌরনর জনরল চারলছ লাট করণওলিছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরীকুল করিকুম্ভ বিদারণ···

২ ···শ্রীযুত কোম্পানীর ঠাঞি জানাইতেছে এবং শ্রীযুত কাপীতেন সাহেবের গোচর করিয়া দরঙ্গ মোকামে লইয়া বাঙ্গাল বরকন্দাজ বর করিয়া আপনার মোকামে বসীয়া আছি অপর গবনর কৌসল বড় সাহেবের নিকট আরাধন···আমাকে এ মুল্লুক দেন এই প্রার্থনা শ্রীযুত কোম্পানী গবর্ণর কৌশল···

৩ সেমতে জেলার সাহেব ইস্তাহারনামা দিয়াছেন যে তুমি জতো তকঃশীর করিআছ তাহা সকল তোমাকে মাফ হইল তুমি ছয়ে মাসের মেআদে খালিসাতে কিম্বা জিলার সাহেবের নিকট হাজির হও।

৪ অত্রানন্দ বিশেষ মাঙ্গরাজ হইতে জরি হইয়া কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন এ শুসংবাদে পরম্যাপ্যাইত হইলাম ৺সর্ব্বত্র জয়ি করিতেছেন করিবেন অপর এথাকার সমাচার সমস্ত গোচর আছে আমার তরফ শ্রীজানকীরাম সরকার উকীল পূর্ব্বাবধি হুজুরে হাজির আছে।

ডক্টর আনিসুজ্জামান বাংলা গদ্যের এ ধরনের জটিলতা ও বিপর্যয় চিহ্ন সম্বলিত দু'টি পত্রের নজীর দিয়ে বলেছেন—দলিল পত্রে ভাষা যেখানে অসরল, সেখানে প্রধানতঃ আরবি-ফারসি পারিভাষিক শব্দের বাহুল্যের জন্য কিংবা কখনো কখনো বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত আরবি-ফারসির মিশেলের জন্য জটিলতা এসেছে।[৪২]

অমরা ডক্টর আনিসুজ্জামান উল্লেখিত দু'টি পত্রও এখানে তুলে ধরাছি—

(ক) সহী শ্রীজুত মহারাজ বাহাদুর—

দস্তক বনাম রাহাদারান চৌকিদারান ও জমিদারান ও কানুনগোয়ান তালুকদারান ও সিকদারান ও দেদারান ও পাইকান পেয়াদাগান ও হরকরআন ডিহিদারান তাহদ্দে বাইয়তান ওগরহ আমলাদারানাং চাকেলে মুরসিদাবাদ হদ্দ নগাদি রাজগঞ্জ প্রতিবেদনান্দ আগে নয়নষুক কাপড় তিন গাটী লবণ পাঁচাহাজার মোন এই দুই জিনিষ মোকাম রাজগঞ্জ জাইতেছে তোমরা কেহো রাহাঘাটে আটক না করিয়া ঠিকানায় জেখানে এ জিনিষ উত্তরিবা তাহা তোমরা চৌকী পহরা দিয়া খবরদারি করিবা আর জখন নৌকা খুলিয়া জাইবেক তখন আপন লোক দিয়া সরহদ্দ ছাড়াইয়া দিবা ইহা খুব তাগিদ জানিবা ইতি—

(খ) রাহদারাণ চৌকীদারান প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—মোকাম জাহানাবাদ হইতে সেঘরে ডুরিয়া ত্রিষ গাটী তাহার সুমার থানে সাত সওথান রপ্ত মোকাম কলিকাতা শ্রীজুত কোম্পানি ইঙ্গরাজ সাহেবের দরুন ইহার হাসিল বিঞ্চীম হিসাব দাখিল জমিদারি সাদর কাছারি অতএব তোমরা রাহাঘাটে মোজাহিম হইয়া আটক না করিবা জেখানে ইহা-দিগের কাপড়ের গাটী উত্তরিবা তোমরা আপন আপন হামরাই দিয়া খবরদারি করিয়া গাটী চলিত সময় আপন লোক দিয়া সরাহদ্দ পার করিয়া দিবা একথা খুব তাগিদ জানিবা ইতি।

কোনো ভাষা অন্যভাষা হতে শব্দগ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়—তাই অন্য যে কোনো ভাষা হতে শব্দ গ্রহণে আমাদের আপত্তিনেই—যদি এর সার্থক ও শৈল্পিক ব্যবহার হয় এবং পারিপার্শ্বিক চেতনাকে ফুটিয়ে তুলে। একমাত্র জোর করে বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে কৃত্রিম ও জটিলতা সৃষ্টি করে ভাষার বিপর্যয়েই আপত্তি। মুসলিম শাসনামালে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার চরমমাত্রায় উঠেছিলো। ভাষার সৌন্দর্য ও শিল্পগুণ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে খেয়াল না রেখেই অনেকে রঞ্জতোষণের জন্য অযথা আরবী ফারসী মেশানো বাংলা লিখতেন। আরবী-ফারসীকে যারা পছন্দ করতেন না রাজভাষা বলে এবং রাজকার্য পরিচালনার জন্য ও চাকুরীর লোভে আরবী-ফারসী শব্দ যুক্ত বাংলা তাঁরাও লিখতেন। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে হয়তো এ ধরনের একটা আলাদা রীতিই গড়ে উঠতো। পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে জোর করে আরবী-ফারসী মিশ্রিত বাংলা লেখার উত্তেজনা কিভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আমরা তা পরে আলোচনা করবো।

## সাত

পোর্তগীজ পাদরীরা যেমন ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা গদ্য চর্চায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, ইংরেজদের ভূমিকাও প্রথমে তাই ছিলো। 'খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচার করা যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্য সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালা পদ্য রচনার উন্নতি হইয়াছিল, সেইরূপ খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালা গদ্য রচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।'[৪৩]

১৭৭৮ হতে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পূর্ববর্তী একুশ বছর বাংলা গদ্যের আর একটি নতুন যুগ। বিশেষত ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। এ বছরই বাংলা-অক্ষরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ ছাপা হয়। পঞ্চানন কর্মকার ছেনি কেটে বাংলা মুদ্রালিপি তৈরী করে এক যুগান্তর আনেন—এবং মুদ্রালিপিতেই ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড-এর A Grammer of the Bengali Language ছাপা হয়।

১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে জেমস অগস্টাস হিকি 'বেঙ্গল গেজেট 'মুদ্রণের জন্য কোলকাতায় সর্বপ্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্লাডউইন 'দি ক্যালকাটা গেজেট প্রেস' স্থাপন করেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পূর্ববর্তী একুশ বছরে ব্যাকরণ, অভিধান, শব্দ সংকলন ও অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের চর্চা দ্রুত গতিতে চলছিলো। এসময় ছয়জন বিদেশী বাংলা গদ্য চর্চায় যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে। বিশেষত ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড বাংলা ব্যাকরণের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনে হ্যালহেড ও ফরস্টারের অবদান সম্বন্ধে এইচ. টি. কোলব্রুক 'এশিয়াটিক রিসার্চসেস' গ্রন্থে বলেন—

Gaura, or as it is commonly called, Bangalah or Bengali is the language spoken in the provinces, of which the ancient city of Gour was once the capital. It still prevails in all the provinces of Bengal, excepting perhaps some forntier districts ; but is said to be spoken in its greatest purity in the eastern parts only ; and as there spoken, contains few words which are not evidently derived from Sanscrit. The dialect has not been neglected by learned men. Many Sanscrit poems have been translated, and some original poems have been composed in it. Learned Hindus in Bengal speak it almost exclusively ; verbal instruction in sciences is communicatd through this medium, and even public disputations are conducted in this dialect. Instead of writing it in the Devanagari, as the Pracrit and Hindevi are writren, the inhabitants of Bengal have adopted a peculiar character, which is nothing else but Deva-nagari difformed for the sake of expeditions writing. Even the learned amongst them employ this character for the Sanscrit language, the pronunciation of which too they in like manner degrade to the Bengali standard. The labours of Mr. Halhed and Mr. Forster have already rendered a knowledge oftheBen gali

dialect accesssible, and Mr. Forster's further ezertions will still more facilitate the acquisition of a language, which cannot but be deemed greatly useful, since it Prevails throughout the richest and most valuable portion of the British possessions in India.[৪৪]

বাংলা গদ্য চর্চায় উল্লেখিত ছয়জন বিদেশী পণ্ডিত হলেন :

১ ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড : এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (১৭৭৮)

২ জোনাথান ডানকান : রেগুলেশন ফর দি এ্যাডমিনিসট্রেশন অফ দি জাস্টিস ইন দি কোর্ট অফ দেওয়ানী আদালত বা ইম্পে কোড-এর বাংলায় অনুবাদ (১৭৮৫)।

৩ এন. বি. এডমনস্টোন : বেঙ্গল ট্রানস্লেশন অফ রেগুলেশন ফর দি এ্যাডমিনিসট্রেশন অব জাস্টিস ইন দি ফৌজদারী অর ক্রিমিন্যাল কোর্ট (১৭৯১)। বেঙ্গল ট্রানস্লেশন অফ রেগুলেশন ফর দি গাইডান্স অফ দি মেজিস্ট্রেটস (১৭৯২)।

৪ হেনরি পিটস ফরস্টার : 'গভর্ণর বাহাদুরের হুজুর কৌনসলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন (১৭৯৩), এ ভোকেবুলারি ইন টু পার্টস, ইংলিশ এ্যান্ড বেঙ্গলী, এ্যান্ড ভাইসভার্সা' (১৭৯৯)।

৫ 'এ. আবাজন : ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকোবৈলরি' (১৭৯৩)।

৬ জন মিলার : দি টিউটর বা শিক্ষাগুরু (১৭৯৭)।

'এই একুশ বছরের ইতিহাসে অমরা মাত্র ছয়জন বৈদেশিক কর্মীর নাম পাইতেছি। ইহাদের কীর্তি ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দ শিক্ষা প্রণয়নে এবং কয়েকটি আইনের বহির অনুবাদ রচনায় মাত্র পর্যবসিত। কিন্তু এই সকল মহানুভব ব্যক্তির অমানুষিক অধ্যবসায় ব্যতিরেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুর্গমপথ দুর্গমই থাকিয়া যাইত। আয়াসপ্রিয় ও শিথিলমনা বাঙালীর দ্বারা এই দুর্গম দুরারোহ ভূখণ্ডে ব্যাকরণ-অভিধানের খোন্তা-কোদাল চালাইয়া একটা পথ গড়িয়া তোলা কঠিন হইত। এই বৈদেশিক ছয়জনের নাম আমরা শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিতেছি।...বাংলা গদ্যের ভিত্তিপত্তনে এই ছয়জন ইংরেজের ব্যক্তিগত

চেষ্টা ও অধ্যবসায় সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাহাদের কালে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বিশৃংখল বাংলা ভাষাকে তাঁহারাই ব্যাকরণ-অভিধানের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন।[৪৫]

এই ছয়জনের গদ্যচর্চা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো—কিন্তু এখানে শুধু বলবো যে, সজনী বাবু তাঁদের গদ্য চর্চায় শুধু বিকাশ ও উন্নতি দেখেছেন কিন্তু তাঁদের গদ্য চর্চায় চরম বিপর্যয়ের দিকটা দেখেননি। বাংলা গদ্য চর্চায়—

১ তাঁদের ধারণা ছিলো বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা তাই বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতায়ন করতে হবে।
২ এ সংস্কৃতায়নে আরবী-ফারসী শব্দের উচ্ছেদ অভিযান।
৩ ইংরেজী বাক্য গঠন।
৪ দেশীশব্দ বিশেষত প্রাকৃতশব্দ ও বাংলা ক্রিয়াপদ বর্জন।

বাংলা গদ্যের স্বভাব ও প্রাণপ্রবাহ এবং স্বতস্ফূর্ত রীতিটি তাঁরা হঠাৎ করে আত্মস্থ করতে পারেননি। বাংলা ভাষার নাড়ীর সাথে তাঁদের যেমন যোগ ছিলোনা তেমনি বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যে ও আলাদা ভিত্তিতেও তাঁদের কোনো আস্থা ছিলোনা। তাঁদের সৃষ্ট গদ্যে শিল্পীমন বা সাহিত্যিক মানসিকতা নয় ঠিকাদারী মানসিকতাই বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলো। আর গদ্য সৃষ্টিতে তাঁদের সামনে কোনো আদর্শও ছিলোনা ফলে শুধু প্রয়োজনের তাগিদে মল্লবীরের মতো তাঁরা শক্তি প্রয়োগ করে বাংলা গদ্যের এক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছেন।

ইংরেজ লেখকেরা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, যেহেতু বাংলা সংস্কৃত হতে এসেছে তাই আরবী-ফারসী প্রভাব পূর্ব পর্যন্ত বাংলাভাষা সংস্কৃত সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিলো। মুসলিম শাসন ও পীড়নে জোর করে আরবী-ফারসী শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। এ মানসিকতা হতেই তাঁরা আরবী-ফারসী শব্দের উচ্ছেদ অভিযান চালায়। তাই জোর করে বাংলা গদ্যকে একদিকে ইংরেজী বাক্য বিন্যাসের আওতায় আনায় অপরদিকে সংস্কৃতায়নের জোর প্রচেষ্টা চালায়। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হ্যালহেড সাহেব এবং

পরবর্তীকালে হেনরি পিটস্ ফরস্টার ও উইলিয়ম কেরী বাংলাভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী-ফারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংল্যান্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলাভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে এই আরবী-ফারসী নিসূদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফঃস্বল আদালতসমূহে আরবী-ফারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; আরবী-ফারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী-ফারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। ফলে দশ পনর বছরের মধ্যে বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে স্বয়ং হ্যালহেড সাহেব এবং বাংলার ক্যাকস্টন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভগবদ্গীতার অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়া সংস্কৃতরীতিতে বাংলা শব্দকোষ সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৪৬]

হ্যালহেডের মানসিকতাও তাই ছিলো—

Hitherto we have seen the formation and construction of the Bengal language in all its genuine simplicity, when it could borrow Shanscsrit terms for every circumstances without the danger of becoming uninteligble, and when tyranny had not yet attempeted to impose its fetters on the freedom of composition· · ·how far the Modern Bengalees have been forced to debase the Purity of their native dialect, by the necessity of addressing themselves to their Mahommedan Rulers. . . (who) obliged the natives to procure a Persian translation to all the papers which they might have occasion to present. This practice familiarised to their ears sueh of the Persian

terms as more immediately concerned their several affairs ; and by long habit they learnt to assimilate them to their own language, by applying the Bengal inflexions and termination.[৪৭]

ইংরেজ লেখকেরা আরবী-ফারসী শব্দের উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতায়নেই শুধু সচেষ্ট থাকেনি—অবাধে দেশী শব্দ ও বাংলা ক্রিয়াপদ পর্যন্ত বর্জন করেছেন এবং ইংরেজী বাক্য রীতিতে বাংলা গদ্য লেখার প্রয়াস চালিয়েছেন। 'এই সব সাহেবী বাংলার রূপে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এখানে বাংলা গদ্যরীতির স্বাভাবিক বিন্যাসের ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে আর এসেছে পাশ্চাত্য ভাষার কমা, সেমিকোলন, কোলন প্রভৃতি যতিচিহ্ন। দু'টিই পেয়েছে পরবর্তী গদ্য সাহিত্য উত্তরাধিকার সূত্রে। এই সব লেখক যখন বাংলা লিখেছিলেন তাঁদের মনে অগোচরে কাজ করেছিলো ইউরোপীয় গদ্যের বাক্যগঠন বিন্যাস। পরবর্তীকালে শক্তিমান লেখকগণও এ প্রভাব থেকে মুক্ত নন।[৪৮]

একদিকে সংস্কৃতায়ন, আরবী-ফারসী শব্দ বর্জন অপরদিকে দেশী শব্দ তথা প্রাকৃত শব্দ বর্জনের ফলে বাংলা ভাষা অনেকটাই কষ্ট-ক্লিষ্ট ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছিলো। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাংলা গদ্যে সাধু ও চলিত বা কথ্য রীতি শুধু এখনই নয় বা প্যারীচাঁদ ও প্রমথ চৌধুরী হতেই নয়—এর আগেও আমরা এ দু'টি রীতির উল্লেখ পাই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আগেও এ দু'টি রীতির নিদর্শন আছে। হ্যালহেড সাহেবের *A grammer of the Bengali Language* গ্রন্থেও দু'টি রীতির কথা বলা হয়েছে। ফরস্টার সাহেবও তাঁর বাংলা ইংরেজী অভিধানে এ দু'টি রীতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, আরবী-ফারসী ও হিন্দি মিশ্রিত সাধারণ মানুষের একটি রীতি, অপরটি গুরুগম্ভীর সংস্কৃত প্রধান রীতি। রামমোহন তাঁর বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বাংলা গদ্যের দু'টি রীতি প্রসঙ্গে বলেছেন একটি 'আলাপের ভাষা' অপরটি 'সাধু ভাষা'।[৪৯] মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও এ দু'টি রীতির কথা বলেছেন—তাঁর মতে একটি 'লৌকিক ভাষা' অপরটি 'সাধুভাষা'।'[৫০] রামমোহনের 'আলাপের ভাষা' আর মৃত্যুঞ্জয়র 'লৌকিক ভাষা' মূলতঃ

একই। বাংলা গদ্যের এ দু'রীতি সম্বন্ধে উইলিয়াম কেরীও সচেতন ছিলেন। কেরীর মতে একটি 'লিখিত বা সাধুরীতি' অপরটি 'মুখের ভাষা'। আমরা পরে তা' আলোচনা করবো।

বাংলা গদ্যের প্রথম অবস্থায়ই অর্থাৎ পুরোনো বাংলা গদ্যে আমরা 'আলাপের ভাষা', 'লৌকিক ভাষা' ও 'মুখের ভাষার' লেখ্যরূপের নিদর্শন পাই। বাংলা গদ্যের এ রীতিটি ছিলো সহজ, সরল ও স্বচ্ছন্দ। পরিতাপের বিষয় সহজ, সরল ও স্বচ্ছন্দ এবং ছোট ছোট বাক্য সম্বলিত ও সহজ অর্থবোধক বলেই পণ্ডিত জনের কাছে এ গদ্য স্বীকৃতি পায়নি। লৌকিক রীতি ও কথ্যরীতিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি বলেই পণ্ডিতজনেরা রায় দিয়েছেন যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পূর্বে বাংলা গদ্য ছিলোনা। পণ্ডিতজনেরা সেদিন মনে করতেন গদ্য ভাষা মানেই জটিল ও দুর্বোধ্য হবে---এবং সহজ হলে তা গদ্য হবেনা। বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্বন্ধে এ ধরনের একটি গল্প আছে।[৫১] দেশী তথা প্রাকৃত শব্দ এবং আরবী ফারসী শব্দ বর্জন করে যার রচনায় যতো বেশী সংস্কৃত শব্দ থাকবে রচনা ততোই উন্নত এ মানসিকতা শুধু ইংরেজ লেখকদের নয়---বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যেও এ-মানসিকতা কাজ করেছে। বাংলা গদ্যকে জটিল ও দুর্বোধ্য করে একটা পিণ্ড তৈরী করার মধ্যেই যেনো তাদের আনন্দ ছিলো।

কোন ভাষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। গভীর ভাবব্যঞ্জক ও অর্থধারক বিদেশী শব্দ যতো গ্রহণ করা যায় ততোই ভাষা শব্দ ও ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ হয়, তবে কৃত্রিমভাবে বা জোর করে নয়---'যে কথাটি নিতান্ত নইলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশী ভিক্ষে, ধার কিম্বা চুরি করে এনো না।'[৫২]

রবীন্দ্রনাথ আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, উর্দু, ইংরেজী বা কোন ভাষার শব্দ গ্রহণেই বাংলা ভাষাকে শব্দসম্পদ ও ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ করতেন না---তবে বাংলা ভাষার নিজস্বতায় তনি ছিলেন প্রত্যয়ী। বিদেশী ভাবসম্পদ ও শব্দসম্পদকে আত্মস্থ করে নেবার প্রচণ্ড শক্তি আছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এটাও রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন---তাই বার বার

বাধার আল ও প্রাচীর ডিঙিয়ে বাংলা ভাষা তার স্বকীয় পথ ও বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। কথারীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'একবার যেমনি একে আত্মপ্রমাণের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তার কারণ এটা জবরদখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই, ফোর্ট উইলিয়াম সংস্কৃতের বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।'[৫৩]

আধুনিক বাংলা গদ্য ইংরেজী গদ্যের কাঠামোতে নির্মিত এ অনস্বীকার্য। এবং বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দসম্ভারের আধিক্য হলেও তিনি সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন প্রাকৃত শব্দের উপর, কারণ সবচেয়ে বড়ো সত্য বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত। বাংলা ভাষার সংস্কৃত আভিজাত্য অপেক্ষা প্রাকৃতরূপকে রবীন্দ্রনাথ বেশী মূল্য দিয়েছিলেন। তাই তৎসম শব্দের প্রাচুর্য অপেক্ষা ইসলাম ও খ্রীস্টান জগতের প্রকৃত সমাজের ঋণের কথা তিনি ভুলতে চাননি, তাঁর কাছে প্রাকৃতিক বাকরীতিও উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর মতে---

'বাংলা ভাষায় অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা এবং তার চেহারা বলে একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু-ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয়নি। সে আউলের মুখে বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলাদেশের চিত্তটাকে একে-বারে শ্যামল করে ছেয়ে রেখেছে। কেবল ছাপার কালির তিল পরে সে ভদ্র সাহিত্য সভায় মোড়লি করে বেড়াতে পারে না।'[৫৪]

একদিকে সংস্কৃত অপরদিকে পর্তুগীজ ও ইংরেজী ভাষার কষ্টক্লিষ্ট অনু-করণে বাংলা ভাষার মৌলধারা ও প্রাণ-প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত শব্দগুলোকে আমরা হারাতে বসেছি, হারিয়েছি,---অথচ ঐ-সমস্ত শব্দে ভাবব্যঞ্জনা, ধ্বনি গাম্ভীর্য ও অধিক অর্থধারণের অগাধ শক্তি ছিলো। বাংলা ভাষার এ মৌলিক ও নিজস্ব শক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সজাগ ছিলেন বলেই বলেছেন---

'সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয়না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হতে বঞ্চিত হয় কিন্তু তবু সংস্কৃত

বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আচরণ, লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের বাহ্য উপায়···বাংলার সংস্কৃতি অংশের ব্যাকরণ বাংলার ব্যাকরণ এক নহে।'[৫৫]

হ্যালহেড সাহেব আরবী-ফারসী শব্দ উচ্ছেদ অভিযানের, দেশী তথা প্রাকৃত শব্দ বর্জনের এবং বাংলাভাষা সংস্কৃতায়নের যে বহ্নুৎসবের অভিষেক করলেন একেই প্রজ্জ্বালিত করলেন জোনাথান ডানকান, এন. বি. এডমোনস্টোন, হেনরি পিট্‌স ফরস্টার, এ. আপজন, ও জন মিলার। এবার আমরা তাঁদের গদ্যের কিছু নমুনা তুলে ধরছি—

১ শ্রীযুত বড় সাহেব ও কৌন্সলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা ইংরেজী ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসের বাঙ্গালা ১৭৭৯ সনের ৮ ভাদ্রে নিরুপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরসিদাবাদ ও ঢাকা ও দিনাজপুর কিম্বা পুরনিয়া ও বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে মফস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতার সদর দেওয়ানি আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইস্তক ১৭৭৪ সন লাগায়দ ১৭৭৯ সন ইংরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড় সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল কিন্তু শ্রীযুত বড় সাহেব ও কৌশলি সাহেব লোক অনবকাশ জন্যে কখন সেই সদর আদালতে বসিতে পারেন নাই একারণ সেই সনের আক্তোবর মাসের ২৪ বাঙ্গলা ১১৮৭/১১ কার্ত্তিক তারিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে একজন হাকিম তাহাদিগের অভিপ্রায় মতে নিযুক্ত হবেন তিনি সেই আদালতে বসিয়া বিচার করিবেন সংপতি তাহা অন্যথা এই স্থির হইল যে সাহেবেরা আপনা হইতে অথবা আপনারদিগের প্রস্থে যাহারদিগেরকে নিযুক্ত করেন তাহারা সেই কার্য্য করিবেন আর মপস্বল দেওয়ানি আদালতের জিলা সকল বিস্তীর্ণ জন্যে লোকের ব্যামোহ হইত ইহা জানিয়াও বিচার শীঘ্র ও ভাল মতে হয় এ কারণ ১৭৮১ সনের ৬ ছয়ঞ্চি আপরিল বাঙ্গলা ১১৮৭ সনের ২৭ চৈত্রমাসে মপস্বলে আর কয়েকস্থানে নূতন দেওয়ানি আদালতের কচহরি মেদিনীপুর ও রঘুনাথপুর ও রঙ্গপুর ও চাতরা ও লোয়া ও দরভাঙ্গা ও ভাগলপুর ও নাটোর ও আজমিরিগঞ্জ ও বাকরগঞ্জ ও ইসলামাবাদ ও মুড়ালিতে নিরুপিত হইয়াছে এবং পূর্বে লোকের আয়াস ও ব্যামোহ

না হয় এজন্য পূরনিয়ার আদালত তাজপুরে নিরুপিত হইয়াছিল এখনও সেই হেতু লোয়ার আদালত মিছইতে ও রঘুনাথপুরের আদালত রাজহাট ও আজমিরিগঞ্জের আদালত সুলতানুইতে স্থৈর্য্য হইল আর ইহার পূর্ব্ব কোন ২ সময় কোন ২ কার্য্যের নিমিত্তে মপস্বলের সকল আদালত ও সদর আদালতের বিচারের কারণ অনেক প্রকার আজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক কথা এমত আছে যে, নূতন আদালত সকলের কার্য্যে আইসেনা।[৫৬] (জোনাথান ডানকান)

২ সেওয়ায় মহালাত মুতালুকে সহর মুরসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাগিরনগর যে এই তিন মোকামে আদালতের সিরিস্তা আলাহিদা মোকবর হইল আর এই তিন আদালতের এলাকার সরই সাহেব জিলা-দিগের তজবিজমতে হইবে মঞ্জুর হইল এবং সেওয়ায় সহর কলিকাতা জেবড় আদালতের তাবে আছে জারি থাকিবেক—

···সকল ফেরকার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেসত তাহাদিগে জাহারা সহজেই অত্যন্ত দুস্থ পেটার তালুকদারান ও বায়াত লোকও আর যেত আবাদ করণওয়ালাদিগের ভালর নিমিথ্যে ও রক্ষা করিবার নিমিথ্যে নবাব গবনর জানরেল বাহাদুর জখন মনাদেব বুঝেন আইন করিবেন।[৫৭] (এন. বি. এডমোনস্টোন)

৩ (ক) হাকিমের উচিত জে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতো দুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেন অতয়েব ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে আইন করণ উচিত জানেন সেকালে তাহাই নির্দিষ্ট করেন কিন্তু এমত সকল আইন নির্দিষ্ট ইহাতে কোন প্রকারে জমীদার ও হজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভুম্যধিকারীদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না।[৫৮]

(খ) সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সদর খাজনার দষসালা বন্দবস্তের জে সকল আইন ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ সেপ্তম্বর ১৮ তারিখে মুতাবিক ২৭ জেলহজ···বাঙ্গালায় হইয়াছে তাহাতে জমির মালিকদিগের খবর দেয়া গিয়াছে জাহারা সরকারের সহিত বন্দবস্ত

করিবেন তাহাদিগের জমির জমা ঐ আইন মাফিক জাহা ধার্য্য হবেক তাহা দশ বত্সরের বরকবার ও হামেসা কায়েম থাকিবেক জদ্যবী শ্রীযুত ইংরেজ কম্পানীর তরফ বিলাতের কার্য্যের মুক্তিয়ার কায়েরা মঞ্জুর করেন নতুবা কায়েম থাকিবেক না।[৫৯]

(গ) যে যে জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারী ভূমির উপর উপরের প্রস্তাবিত সকল আইনের মতে সরকার হইতে মোকাররী জমার ধার্য্য হইয়া তাহারদিগের অস্বীকার ও নাকবুলের নিমিত্ত সে ভূমি সরকারের খাস তহশীলে আশীয়া কিম্বা তাহা সরকার হইতে অন্য অন্য লোককে ইজারা দেয়া গিয়া থাকে তাহার মধ্যে যাহারদিগের ভূমি সরকারের খাস তহশীলে আশীয়া থাকে তাহারদিগের ঐ শ্রীযুত জানাইতেছেন জে ঐ সকল আইনের মতে সেই ভূমির উপর যে মোকাররী জমার ধার্য্য হইয়াছে।[৬০] [ ৩ ( ক, খ, গ, ঘ ) হেন্‌রি পিট্‌স ফরস্টারের গদ্য ]

(ঘ) নেজামত আদালতের আমলাহায়ের দেয়া সম্মত কতওয়াক্রমে এবং তাহারা যে সকল মাতবর কেতাবের প্রমাণ দেন তদনুসারে বুঝা যায় জে কেহ কাহাকেও কুচেষ্টাপূর্ব্বক বধিতে উদ্যত হইলে যদাপি সেই উপলক্ষি দৈববিঘটনাৎ কেহ বধ হয় তবে সেই উদ্যত ব্যক্তি কেছাছ অর্থাৎ প্রতিহত্যার শাস্তির যোগ্য ঠাহরে না এবং এইরূপ অন্য যে বধ নিহন্তার ভ্রান্তি প্রযুক্ত কিম্বা তদুপলক্ষিত কোন দৈববিঘটনে হয় তাহাতেও কেছাছ শাস্তিজনক কতল সমদ যাহাকে জ্ঞানকৃত বধ বলা যায় তাহা না হইয়া দীয়ত দণ্ডজনক কতলখতা ঠাহরে।[৬১]

৪ আমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশয়ের সহিত। যে কোন কেতাব না অদ্যাবধি প্রকাশ পাইয়াছে সিখাইতে তোমাদিগেরকে ইঙ্গরাজি কথা সহজে আর অনায়াসে। তাহাতে লউয়েছে আমারে সাংগ্রহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব। এই উমেদ করো জে এ তোমাদিগের সাহষের দ্বারায় মঞ্জুর হয়।

আমার মনস্ত ছিল সঁপরোধ করিতে এই কেতাব সমস্কৃততে। কিন্তু আমি এক্ষেণে দেখিলাম জে অতি অল্পলোক আছে জে এ বিশয় বুঝে। অতয়েব আমি বিবেচনা করিয়া এ তরজমা করিয়াছি চলিত কথার দ্বারায়।[৬২]

এ ভয়াবহ বাংলায় ভূমিকার পরই আমরা 'The Tutor'-এর ভেতরে প্রবেশ করে পাই—'সরু রকম তণ্ডুল আইসে পাটনা বর্দ্ধমান আর রাড়ের অঞ্চল হইতে আর মোটারকম আইসে বাখরগঞ্জ ও লক্ষিপুর রংপুর ঘোড়াঘাট হইতে'··মহাশয় বাখরগঞ্জ ও লক্ষিপুরের তণ্ডুল সকল হইতে সস্তা, পাটনাই তণ্ডুলের তরো এদেষ হইতে ভালো কিন্তু হিন্দুস্থানের বাঁশবেরালি-তুণ্ডুল পাটনা হইতে সরু

হা মহাশয় এই দিশ্টান্ত ঠিক। দুরের কারণে অতি অল্প বাঁশবেরালি তণ্ডুল এদেশে আইসে···

অগ্রহায়ণ আর পৌষ মাসে তাহারা কোনো সময়ে খরিদ করে কিতঙ্কে দুই মোন আর অন্য সময় আড়াই মন। কলিকাতায় আসিয়া খরচবাদে তাহারা পায় কখন ডেড় আনা নতুবা দুই আনা কিতঙ্কে

মহাশয় খরচ বিস্তর নৌকা ভাড়া ওঁ মাজির ওঁ ডাড়ির মাহিনা ঘাটের হাশিল ওগয়রহো বাখরগঞ্জ হইতে দাড়ায় চারিআনা আর পাটনা হইতে খরচ হয় কমবেস ছয়আনা কিতঙ্কে।

বরসাকালে তাহারা নৌকায় আর সুকনাকালে বলদে কর‍্যা আনে বলদে তণ্ডুল পাঠানো নৌকা হইতে দ্বিগুণ খরচ হয়।

বাঙ্গালায় মুরাসিদাবাদ পুরল্যা আর ভাগলপুরের তরপ কিন্তু অনেকে হয় বেহারে বাঙ্গালা হইতে।[৬৩]

পূর্বের গদ্যের সাথে তুলনা করলেই বুঝা যাবে বাংলা গদ্যের এ কি চরম বিপর্যয়।

**আট**

বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান যেমন অনস্বীকার্য তেমনি এর বিপর্যয়ের ভূমিকা আরো বেশী স্বীকার্য।

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর বিপর্যয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ক্ষমতা এলেও প্রকৃতপক্ষে কোম্পানী শাসনভার গ্রহণ করে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে এবং তখন হতেই ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক সুবিধের জন্য গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসই প্রথম এ দেশে ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছিলেন এবং পরবর্তীকালে কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা

বাধ্যতামূলক করা হয় ও দেশীয় ভাষা শিখেনি বলে 'কটকের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট মি. ব্রিস্টোকে অপসারিত করা হয়েছিলো'।[৬৪]

কোম্পানীর কর্মাচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত এতোই তাগিদ আসে যে, ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী ওয়েলেসলী এ মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করেন যে, যে সমস্ত বৃটিশ কর্মচারী ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের পহেলা জানুয়ারীর মধ্যে দেশীয় ভাষা, আইন ও আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না করবে, তাকে আর চাকুরীতে বহাল রাখা চলবেনা। বিজ্ঞপ্তির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো—

From and after the Ist January, 1801 no servent will be deemed eligible to any of the offices here in after mentioned, unless he shall have passed an examination the nature of which will be here after determind in the laws and regulations, and in the languages, a knowledge of which is here by declared to be an indispensible qualifications.[৬৫]

অবশেষে ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়েলেসলী তাঁর মিনিট উপস্থাপন করেন ১৮ই আগস্ট এবং কলেজের কাজ প্রকৃত-পক্ষে শুরু হয় ২৪ শে নভেম্বর। ১৮ই আগস্ট মিনিটের প্রস্তাবনায় কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বলা হয়—

A college is hereby founded at Fort William in Bengal, for the better instruction of the junior civil servent of the company in such branches of literature, science and knowledge as may be deemed necessary to qualify them for the discharge of the duties of the different offices, constituted for the administration of the Government on the British possessions in the East Indies.[৬৬]

যে যে বিষয়ে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের শিক্ষা দেয়া হবে ও শিক্ষক নিয়োগ করা হবে মিনিটে তাও উল্লেখ করা হয়—

১ : ভাষা—আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, বাংলা, তেলেগু, মারাঠী, তামিল, কানাড়ী, ইউরোপের আধুনিক ভাষাসমূহ, গ্রীক, লাটিন, ক্লাসিকেল ইংরেজী সাহিত্য।

২ : আইন—মুসলিম আইন, হিন্দু আইন, বৃটিশ আইন, নীতিশাস্ত্র ও আইন গ্রন্থ, গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রচারিত আইনসমূহ, রাজনীতি ও অর্থনীতি।

৩ : প্রাচীন আধুনিক ইতিহাস—হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত।

৪ : বিজ্ঞান—উদ্ভিদ, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা।

কলেজে প্রথমে আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী বিষয়ে ক্লাশ শুরু হয়। বাংলা বিভাগ তখনো চালু হয়নি—মূল সমস্যা ছিলো বাংলার অধ্যাপক ও পাঠ্য পুস্তকের অভাব। বাংলা-বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো কারো কথা কলেজ কর্তৃপক্ষ তখনো অবগত ছিলেন না। তবে শ্রীরামপুর মিশন হতে বাংলায় বাইবেলের অনুবাদের জন্য ওয়েলেসলী উইলিয়াম কেরীকে জানতেন—তারই নির্দেশ মতো কলেজের প্রভোস্ট ডেভিড ব্রাউন উইলিয়াম কেরীকে বাংলা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। কেরী ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন এবং ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে কলেজে যোগদান করেন।

কেরী প্রথমে যে সমস্ত পণ্ডিতদের নিয়ে বাংলা গদ্যচর্চা ও পাঠ্য পুস্তক রচনার আরম্ভ করেন তাঁরা হলো—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (প্রধান পণ্ডিত), রামনাথ বাচস্পতি (২য় পণ্ডিত), শ্রীপতিরায়, আনন্দচন্দ্র শর্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, পদ্মলোচন চূড়ামণি, রাম রাম বসু।

এ ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য পণ্ডিত হলেন—লেফটেনেন্ট উইলিয়াম প্রাইস, রামজয় তর্কালঙ্কার, কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত, শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, রামকুমার শিরোমণি, গদাধর তর্কবাগীশ, রামচন্দ্র রায়, গোলকনাথ শর্মা, চণ্ডীচরণ মুন্সী, তারিণীচরণ মিত্র, নরোত্তম বসু, হরপ্রসাদ রায়।

১৮০১-১৮২২ এ একুশ বছরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা গদ্যচর্চা ও পাঠ্যপুস্তকের একটি তালিকা দেয়া হলো—

| | | | |
|---|---|---|---|
| রামরাম বসু | : | রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র | (১৮০১) |
| | | লিপিমালা | (১৮০২) |
| উইলিয়াম কেরী | : | কথোপকথন | (১৮০১) |
| | | ইতিহাস মালা | (১৮১২) |
| মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার | : | বত্রিশ সিংহাসন | (১৮০২) |
| | | হিতোপদেশ | (১৮০৮) |
| | | রাজাবলী | (১৮০৮) |
| | | প্রবোধচন্দ্রিকা | (১৮৩৩) |
| | | বেদান্ত চন্দ্রিকা | (১৮১৭) |
| গোলকনাথ শর্মা | : | হিতোপদেশ | (১৮০২) |
| তারিণীচরণ মিত্র | : | ওরিয়েন্টাল কেবুশিষ্ট | (১৮০৩) |
| চণ্ডীচরণ মুন্সী | : | তোতা ইতিহাস | (১৮০৩) |
| | | ভগবদ গীতা | (?) |
| রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় | : | মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র | (১৮০৫) |
| রামকিশোর তর্ক চূড়ামণি | | হিতোপদেশ | (১৮০৮) |
| হরপ্রসাদ রায় | : | পুরুষ পরীক্ষা | (১৮১৫) |
| কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন | : | পদার্থ কৌমুদী | (১৮২১) |
| | | আত্মতত্ত্ব কৌমুদী | (১৮২২) |

বাংলা গদ্যের বিপর্যয় ও সংস্কৃতায়নে এবার প্রথমেই আমরা উইলিয়াম কেরীকে দিয়ে আলোচনা করবো—

কেরী ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ছাত্রদের সম্বোধন করে 'পাবলিক ডিস্‌পিউটেশানস' এর শেষে যে বক্তৃতা দেন এতে বলেন—"হিন্দুদের মতে দীর্ঘকাল বাস করে আমি বৃদ্ধ হয়েছি।...বঙ্গীয় ভাষা আমার কাছে এখন মাতৃভাষার মতোই আয়ত্ত হয়েছে। এ সুদীর্ঘকাল এখানে এদেশবাসীদের সহিত ঘনিষ্টতার ফলে এমন সব বিষয় জানিবার সুযোগ হইয়াছে যা ইতিপূর্বে কারো হয়েছে কিনা সন্দেহ। এখন আমি

নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, এদেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনি পরিচিত হয়েছি যে, সময়ে সময়ে নিজেকেই দেশীয় বলে সন্দেহ হয়।"[৬৭]

'কেরী মাত্র সাত বৎসরের চর্চায় বাংলা ভাষা সম্পর্কে শুধু প্রভূত জ্ঞান অর্জনই করেন নাই, ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের মধ্যে ইহার উৎকর্ষ এমনই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ ভাষা সমূহের মধ্যে ইহাকে স্থান দিতে তাহার বাধে নাই।'[৬৭ক] এদেশে আসার সময় জাহাজেই কেরী টমাস রো'-এর কাছে বাংলা শিখেন। এবং এসে মদনাবাটি অবস্থানকালে জনসাধারণের প্রচলিত যে বাংলা সে বাংলা আয়ত্ত করেন। 'বাঙালী চিরকাল কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, বাক-বিতণ্ডা এমনকি কলহ-মারামারিতে গদ্য ব্যবহার করে আসছে, কেউ সেসব পত্রপুটে ধরে রাখেনি, কোন দেশেই কেউ বড় ধরে রাখে না।' কিন্তু এখানেই হচ্ছে বাংলা গদ্যের আসল ভিত্তি—বাঙালীর মুখেরকথা।'[৬৮] এ গদ্য সহজ, সরল ও ঐক্য সমন্বিত। কেরী প্রথম এ গদ্যেই লিখতেন —লিখতেন বাঙালীর মুখের গদ্যে আর কলমের গদ্যে।

কেরী প্রথমে বাংলা গদ্যের রূপ ও রীতি এবং স্টাইল নিয়ে কোনো চিন্তাই করেননি। তাই বাংলা গদ্যকে জটিল ও সংস্কৃতায়নের কোনো উদ্দেশ্যেই তাঁর ছিলোনা। যতোটুকু সম্ভব সহজ ও বোধগম্য করে তোলাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। বাইবেলের অনুবাদেই আমরা তাঁর এ মানসিকতার পরিচয় পাবো।—

'প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী। পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান হইলেন জলের উপর। পরে ঈশ্বর বলিলেন দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল তখন ঈশ্বর সে দীপ্তি বিলক্ষণ দেখিলন। তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তি অন্ধকার বিভন্ন করিলেন। ঈশ্বর ও দীপ্তির নাম রাখলেন দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্র। সন্ধ্যা ও প্রাতকাল হইল প্রথম দিবস।'[৬৯]

হ্যালহেড বা ফরস্টারের মতো প্রথমেই ভাষাপণ্ডিত হয়ে তিনি গদ্য লিখেননি আর তাঁদের মতো প্রথমে তিনি সংস্কৃতের প্রবক্তাও ছিলেননা। বাইবেলের বাণীকে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেয়াই ছিলো তার উদ্দেশ্য, পাণ্ডিত্য তিনি দেখাননি। যেমন—

'বাহিরে আইস এবং আস্বাদ হও এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শকরিওনা এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ এই মত বলেন সর্বশক্ত ভগবান।'[১০]

এরপর হতেই কেরী আস্তে আস্তে হ্যালহেড, ফরস্টার ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের খপ্পরে পড়েন এবং বাংলা-ভাষার মূল হতে সরে এসে সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হন।

From his Second Mudnabati year Carey gave a third of his long working day to this language, which Ram Ram Basu extolled as almost divine. It was India's hallmark of culture, the franehise of her real aristocracy ; the tongue where in her seripture and classics were all enshrined ; tne speech which unlocked her very soul : the mother and queen of her many vernaculars. The conquer this was to lay open dozen derivatives ; to take this stronghold was to win a multifold domain.[১১]

এই প্রথম কেরীর মনে ভাষার মাধ্যম নিয়ে চিড় ধরলো। তাহলে সংস্কৃত, বাংলা ও প্রচলিত বাংলা এর মধ্যে পার্থক্য কি? এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি করে পিয়ার্সকে চিঠি লিখেন—

Sould vou you pursue the knowledge of the Hindoo language it will no doubt have its use : but could you learn to read, and understand and pronounce well all the books that are written in that language, yet not one in a hundred of the people would understand you, nor could you understand them so different is the language called Bengalee (which spoken by the higher ranks of Hindoos) from the common language of the country, which is a mixture of Bengalee, Hindoostanee, Persian, Portugues, Armenian and English, that is a mere jargon. I much question wheather Moonshee can translate the Bible so at to be understood by the common people, and the less so as there is an alteration in their dialect every ten or twelve

miles ; an if he could I am persuaded that he would be ashamed of writing language so completely ungrammatical.[৭২]

এবার কেরীর মনে প্রচণ্ড সন্দেহ তিনি কি সংস্কৃতধর্মী গদ্য না লিখে বাংলা চলিত বাংলায় লিখে ভুল করেছেন এবং তাঁর লিখিত বাংলা কি ভুল? নিজের ভাষা সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে বলেই তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেন---

I have translated the Gospel by John, and the Epistle to the Galatians myself, without his (Ram Ram Basaus) help ; and the common people understand it much better them his ; but it would be scouted by all above the rank of a farmer.[৭৩]

'সংস্কৃত ও চলতি বাংলা, এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া কেরী কিছুকাল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কোন ব্যাকরণ অভিধানের আশ্রয় না পাইয়া শেষ পর্যন্ত নিজেই সংস্কৃতের আদর্শ ধরিয়া ব্যাকরণ অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করেন।'[৭৪]

এরপর থেকে কেরী বাংলা গদ্যের শুধু সংস্কৃতায়নেই তৎপর হননি--- বরং আরবী-ফারসী শব্দ উচ্ছেদ অভিযানে এক জেহাদী মনোভাব গ্রহণ করেন এবং এখান থেকেই তাঁর ধারণা দৃঢ় হয় যে, বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা, আর এ ধারণা হতেই তিনি লিখেন— The Bengali is the purest of languages which derived from Sanskrit.[৭৫]

এ জেহাদী মনোভাবের ফলেই বাংলাভাষায় যে সমস্ত আরবী-ফারসী শব্দ স্বাভাবিক ভাবে এসেছিলো—ঐ সমস্ত শব্দের উপর তিনি শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে বিশুদ্ধ সংস্কৃত রীতিতে বাংলা গদ্যরীতি গড়ে তোলার জন্য মল্লযুদ্ধ চালিয়ে ছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি যে, আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগে রাম রাম বসু 'রাজা প্রতাপাদিত্য' রচনা করলে কেরী অপ্রসন্ন হন, তাই কেরী সাহেব নাটকীয় ভাবে রাম রামকে দিয়ে সংস্কৃত রীতিতে 'লিপিমালা' লিখিয়ে নিয়েছিলেন---যেখানে একেবারেই কোনো 'যাবনীশব্দ' ছিলোনা, যেমন---

'এইমতে প্রেমাসক্ত সতী ও মাতাকে প্রণাম করিয়া আর২ সমস্ত ভগিনী ও অমাত্যগণেকে সম্ভাব করিয়া যজ্ঞস্থানে পিতার নিকট যাইয়া

প্রণাম করিলে দক্ষ তাহাকে দেখিবামাত্রই হরকোপে কোপিত হইয়া শিবনিন্দায় প্রবর্তন হইল। কহিল কন্যে তুমি কি মর্মে এখানে আসিয়াছ তোমার স্বামী শ্মশানে-মশানে তাহার অবস্থিত হাড়সালা গলায় সাপ লইয়া তাহার খেলা বাদিয়ার বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটনা তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম না। এ দেব-সভা আমি ব্রহ্মার পুত্র বাদিয়ার নিমন্ত্রণ দেবসভায় হইতে পারেনা। সতী কহিলেন পিতা এমত কুৎসা মহাদেবের প্রতি কহ কেন মহাদেব দেবাদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি যাহার পদযুগে শরণাগত যে হর মহাবীর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিলেন যে হর কালকুট পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিলেন—তাহাকে তাহাকে কুৎসা বাক্য তোমা ব্যতিরেকে কেহ কহেনা তুমি এ অনুচিত ক্রিয়া কেন কর। কহিল দক্ষনিন্দার প্রতিফল পাইবা যে মুখে শিবনিন্দা করিলা তাহা তোমার নাশ হইয়া ছাগল বদন হইবেক এই সকল বাক্যে দক্ষ পুনর্বার শিব নিন্দা করিতে প্রবর্ত হইলে সতী মহাক্রোধে উত্থান করিয়া কহিতেছেন সকলের উপযুক্ত গুরুনিন্দা শ্রবণে লোক নিন্দকের শির ছেদন কারবেক নতুবা নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিংবা সেস্থান ত্যাগ করিবেক আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করিব তোমার আত্মজা তনু রাখিবনা। এই কহিয়া বসন আটিয়া পরিয়া যাইয়া মধ্যস্থানে বসিয়া শিব-রূপ ধ্যানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।[৭৬]

অথচ হ্যালহেড ও ফরস্টার-এর আরবী-ফারসী শব্দ উচ্ছেদ অভিযান সমর্থন না করে সার্থক প্রয়োগযুক্ত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের প্রবক্তা হয়ে তাঁর ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কেরী লিখেছিলেন—

a multitude of words, originally persian or Arabic are constantly employed in common conversation, which perhaps ought to be considered as enriching rather than corrupting the language.[৭৭]

আরবী-ফারসী শব্দ যে কিভাবে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে তাই এখানে মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন কেরী।

পরবর্তীকালে দেখা যায় বাংলা গদ্যের সংস্কৃতায়নের ভূমিকায় শুধু কেরীর নিজের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত থাকেনি—সংস্কৃতায়নের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সকল পণ্ডিতকেই প্রভাবিত ও বাধ্য করেছিলেন।

কেরীর কথোপকথনের গদ্য আদর্শ ও শিল্পিত বাংলা গদ্য নয়। আঞ্চলিক ও গ্রাম্য শব্দ অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা গদ্যের প্রাণ প্রবাহকে আড়ষ্ট ও জটিল করেছে।—

: আসোগো ঠাকুরঝি নাতে যাই।
: ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।
: আমরা মাচ আর কলাইর ডাইল আর বেগুন ছেচকি করেছিলাম। তোদের কি হইয়াছিল ?
: আমাদের জামাই কাল আসিয়াছে রামমণিকে নিতে। তাহাতে শাকের ঘন্ট সুক্তানি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্বল হইয়াছিল।
: কে রেন্ধেছিল বড় বৌ না মেঝা বৌ।
: বড় বৌই রান্ধিয়াছিল। তিনি কুটনা বাটনা করে দিয়েছেন।
: তোদের বৌ কেমন কেমন রান্ধিতে বাড়িতে পারে।
: হা বুন সে বৈ আর কে রান্ধে মেয়েরা কেহ এখানে নাই আপনি কাচা বাচা নিয়া নড়িতে পারিনা সকল কাম বড় বৌ করে ছোট বৌডা বড় হিজল দাগুড়া অঙ্গ নড়েনা আর সদায় তার ঘাকড়া কি করি বুন। সহিতে হয় যদি কিছু বলি তারে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে পারেনা কিন্তু বোন কালা হাঁড়ি পানে চেয়ে বড় বৌটি অতি ভাল এ সংসারের কাম কাজকরে আর ছেলেপিলে খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমাদের সেবা সুস্থ করে তাহার জন্য আমার কোন ব্যামহ নাই।

লোকমুখের ভাষাকে কেরী গ্রহণ করবেন এতে আপত্তির কিছু নেই। একদিকে বাইবেল অনুবাদের তাগিদ, অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকের নব্য ইংরেজী গদ্যের দৃষ্টান্ত স্বভাবতই কেরীকে লোকমুখের ভাষার প্রতি উন্মুখ করেছিলো। কিন্তু এই প্রবণতার প্রধান ত্রুটি এই যে, লোক-মুখের ভাষা বলে নিতান্ত অশিক্ষিত লোকের ব্যবহৃত ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন, বাঙালী শিষ্ট সমাজের ভাষা গ্রহণ করেননি। এদেশে তখনও রাধাকান্তদেব, রামমোহনের পর্যায়ভুক্ত শিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের ব্যবহৃত ভাষাটাই শিষ্ট সমাজের ভাষা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন, আদালতী ভাষা ও পণ্ডিতী ভাষার মধ্যবর্তী বিষয়ী লোকের

ভাষা। খুব সম্ভব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রবেশ করে কলকাতায় স্থায়ী হয়ে বসবার আগে বাঙালী শিষ্ট সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এমন ঘনিষ্ট হয়নি যাতে তাদের ভাষাকে তিনি গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি বলে গ্রহণ করতে পারেন।[৭৮]

'কথপোকথনে'র বাংলাকেও কেরী পরে পরিবর্তন করে সংস্কৃতায়ন করেছেন। শেষ পর্যন্ত কেরীর বিশ্বাস এমনই হয়ে দাঁড়ালো যে, সংস্কৃতায়ন না হলে বাংলা অশুদ্ধ হবে। তাঁর এ অনড় বিশ্বাস উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হয়েছিলো। একমাত্র রাম রাম বাসু ছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আর সব পণ্ডিতই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ। তিনি বারবার রাম রাম বসুকে ভালো সংস্কৃত জানার জন্য তাগিদ দিতেন এবং বলতেন ভালো সংস্কৃত না জানলে ভালো বাংলা লেখা যায়না।

আমার ধারণা এ বিশ্বাস বিদ্যাসাগরেরও ছিলো। যেমন—

ক যাঁরা ইউরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন এবং সেগুলোকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাংলাভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেননা। সেই জন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

খ যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

গ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, যাঁরা কেবল ইংরেজীবিদ্যায় পারদর্শী তাঁরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারবেন না। তাঁরা এত বেশী ইংরেজী ভাবাপন্ন যে, তাদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেয়া হয়, তাহলে তাঁরা শত চেষ্টা করেও পরিমার্জিত দেশীয় ভাষায় কোন ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

ঘ তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরজী সাহিত্যে ভালোভাবে শিক্ষা দেয়া হয়, তাহলে তাঁরাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।[৭৯]

কিন্তু বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সংস্কৃতায়নে নয় স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং একে মৌল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতায়নে যে কেরী কতোটুকু অগ্রসর হয়েছিলো এরই প্রমাণ পাবো আমরা তাঁর 'ইতিহাসমালা'য় এবং আমরা আরো দেখবো যে, বাইবেলের অনুবাদ হতে আরম্ভ করে 'ইতিহাস মালা' পর্যন্ত তাঁর গদ্যরীতির কি দুস্তর ব্যবধান! দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

> কোন সাধুলোক ব্যবসায়ের নিমিত্তে সাধুপুর নামে এক নগরে যাইতেছিলেন পথের মধ্যে অতিশয় তৃষ্ণার্ত হইয়া কাতর হইলেন নিকটে লোকালয় নাই কেবল এক নিবিড় বন ছিল তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথাতে এক মনুষ্য একাকী রহিয়াছে। ঐ সাধু তাহাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কে তোমার বসতি কোথায়! সে কহিলেন আমার নাম খলেশ্বর আমার নিবাস সাধুপুর গ্রামে। এই কথা শুনিয়া সাধু বিবেচনা করিলেন এ ব্যক্তি সাধুপুর নিবাসী ইহা হইতে সাধুপুরের সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিব। পরে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কি নিমিত্তে এতাদৃশ ভয়ানক কাননে রহিয়াছ। খলেশ্বর উত্তর করিলেক যে সর্প ব্যাঘ্র ভালুকাদি হিংস্র জন্তু আমাকে ভক্ষণ করিবেক এই আশাতে এই বনে প্রত্যহ বসিয়া থাকি।[৮০]

এ গদ্য একান্তভাবেই সংস্কৃতায়ন এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রভাবও এখানে সুস্পষ্ট। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে একমাত্র রাম রাম বসুই সংস্কৃত জানতেননা আর সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং কেরীর প্রভাবে সংস্কৃতায়নের প্রভাবটা যে তাঁদের মধ্যে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠবে এ স্বাভাবিক। এঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় একজন শক্তিধর ভাষাশিল্পী। বাংলা গদ্যরীতি নিয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে ভাষা রীতি নিয়ে এতো পরীক্ষা নিরীক্ষা আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তবে বাংলা গদ্যের সংস্কৃতায়নেই তার মুখ্য ভূমিকা ছিলো। দৃষ্টান্ত :

> ক দুর্গম বন পর্ব্বতে কন্টেকোদ্ধার করিয়া প্রথম পথ প্রবর্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতদের কর্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া

সেই পথের পূর্বাপেক্ষা উত্তম তত্ত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতদের হইতে বড় হননা যে প্রথম পথ প্রবর্তক সেই বড় ও তৎ প্রবর্তিত ও তদুত্তর পণ্ডিত পরিষ্কৃত যে পথ সে পথ। মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ ইতি। আধুনিক ধনমদমত্ত ভ্রান্তেরদের স্বাহঙ্কার কুজ্ঞানেতে কুৎ যে পথ সেপথ কেবল লোকবিনা শার্থ কিম্বা তাদের রাজপথ পরিত্যাগে নূতনপথ গামীরা বিপদগ্রস্ত অবশ্য হয় ও গমনকালে নানা নিষেধ বাক্য না মানিয়া তৎপথগামীরা ততোধিক বিপত্তি ভাগী হয়।[৮০ক]

খ দক্ষিণ দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্যে রাজরাজী শিরোরত্ন রঞ্জিতচরণ উজ্জয়িনী বিজয় নামে এক সার্ব্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরকেশরিনামা একদিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বনভ্রমণজনিত পরিশ্রমতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণি-স্তনসুন্দর ইন্দীবর কৈরবকোরক সুন্দরী মুখমনোহরান্দোলিতোৎ ফুল্ল-রাজীর নির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্কারণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘ কালীন দিবাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্যজন-সমাজাগমন প্রতীক্ষ'তে উপবিষ্ট হইলেন।[৮১]

গ পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সৎপুরুষদের নির্ম্মজলবদবুদ্ধিতে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্ত লেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না। কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়বোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরান্মুখ হন তেমনি সালঙ্করা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদায়ার্থ বোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পরান্মুখ হন।[৮২]

এবার 'হিতোপদেশ' থেকে একটা উদাহরণ নেয়া যাক—

ভাগীরথী তীরে পাটলীপুত্র নাম নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণে যুক্ত সুদর্শন নাম রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময় কাহারও কর্তৃক পাঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন। তাহার অর্থ এই অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু

ইহা যাহার নাই সে অন্ধ। আর যৌবনও ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেই অনর্থের নিমিত্ত হয় যেখানে এ চতুষ্টয় সেখানে কি হয় কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া সে রাজা অজ্ঞাত শাস্ত্র এবং সর্বদা বিপথগামী আপন পুত্রেরদিগের শাস্ত্র বিজ্ঞাপনার্থে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন। যে পুত্র পণ্ডিত ও ধার্মিক নয় সে পুত্র হওয়াতে কি প্রয়োজন বরং অনর্থ হয় যেমন কর্ণ চক্ষুতে কিছুই প্রয়োজন নাই প্রত্যুত কাণ চক্ষু কেবল পীড়ারি কারণ।[৮৩]

সংস্কৃতের প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের অনুরাগ স্বাভাবিক—এ আলোচনা আমরা আগেই করেছি। দুঃখ যে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন স্টাইল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষা নয় সংস্কৃতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন তিনি।

কেউ কেউ 'বত্রিশ সিংহাসনে'র ভাষার স্বচ্ছতার কথা বলেছেন। কিন্তু এ ভাষাও সংস্কৃত রীতির। এর ভাষাও জটিল এবং সংস্কৃতের অনুবর্তন মাত্র। উদাহরণ দিচ্ছি---'হে মহারাজ শুনো রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতে স্থির থাকেনা। রক্ত মাংসা মলমূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীর ও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকল আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানীজনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদ ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্যবস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্তব্য। নিত্যবস্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেকে কেহ নয় তাহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার কারাগার হইতে মুক্তি পায়।'[৮৪]

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষারীতি একান্তভাবেই সংস্কৃত ঘেষা। সংস্কৃত বাক্য-রীতির জটিলাবর্ত হতে তিনি বের হয়ে আসতে পারেননি। এবং যেখানে বের হয়ে আসার চেষ্টা করেছেন, সহজ-সরল বাকরীতির উদ্যোগ নিয়েছেন সেখানেই ভাষার ভারসাম্য হারিয়েছেন---সংস্কৃত ক্রিয়া-পদের প্রভাবও তাকে সম্মোহিত করে রেখেছে। তাঁর এ ধরনের ভাষা-রীতির একটা উদাহরণ দেয়া যাক---

'দ্বারবতী নামে পুরীতে কোন গোপের বধূ থাকে সে ভ্রষ্টা গ্রামের কোটালের এবং তাহার পুত্রের সহিত ক্রীড়া করে পণ্ডিতেরা তাহা

কহিয়াছেন কুষ্ঠেতে অগ্নি তৃপ্ত হয় না নদীতে সমুদ্র তৃপ্ত হয়না সমস্ত প্রাণীতেও যম তৃপ্ত হয়না পুরুষেতে স্ত্রী তৃপ্ত হয়না। অপর স্ত্রীলোক দানেতে তুষ্ট হয়না ও সম্মানে তুষ্ট হয়না সারল্যতে তুষ্ট হয়না ও সেবাতে তুষ্ট হয় না শাস্ত্রেতে বশীভূত হয় না যেহেতু স্ত্রীজাতিরা সর্বপ্রকার বিষম।[৮৫]

রাম রাম বসুর যেমন ছিলো প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের গভীরতা---তেমনি ছিলো পরিমিতি বোধের অভাব, শিল্পে অসচেতনা ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। 'সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, বাংলা শব্দ---যেমন যা এসেছে রাম রাম বসু পাশাপাশি তা' বসিয়ে যা কাণ্ড করেছেন, তা এখন ভাবাই যায় না আর অন্বয়ের প্রয়োজনও তাকে সংযত করতে পারতোনা। সম্ভবতঃ তাঁর সময় ও সংযমের অভাব ছিলো---আর গদ্যের কোনো আদর্শ সম্মুখে না পেয়ে একটা কিছু খাড়া করাই ছিল তার কাজ। যা করেছেন সেই ভাষা সত্যিই কোন নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির পর্যায়ে পড়েনা। ইহার উপমা কেবল ইহাই A kind of mosaic half Persian, half Bengal. অবশ্য ব্যতিক্রম অনেক আছে কিন্তু আদর্শের অভাবে এ ধরনের কাণ্ড এই গদ্যের প্রথম যুগে আরও কিছু কাল চলেছে। তাঁর গদ্য তাই তাঁর চরিত্রের প্রতিলিপি হয়ে উঠেছে। তাতে চাতুর্য আছে---সৃষ্টি শক্তি নেই, সাহস আছে---শৃঙ্খল নেই, না হলে এক এক সময় তিনি প্রায় সহজ গদ্য লিখে উঠেছিলেন---কিন্তু তখনই বাংলার স্বাভাবিক অন্বয়নীতি ভুলে কথার ঝোঁকে অন্য পথে চলেছেন।"[৮৬]

বাংলা গদ্যরীতি সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন :

'আমাদের দেশে সেকালে ভদ্র সমাজে তিন প্রকারের বাঙ্গলা প্রচলিত ছিলো। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত, তাঁহাদের বাঙ্গালায় অনেক উর্দু মিশান থাকিত। যাহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন, তাহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। ওই দুই ক্ষুদ্রসম্প্রদায় ভিন্ন বহু সংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন। তাহাদের বাঙ্গালায় উর্দু ও সংস্কৃত দুই-ই মিশান থাকিত। কবি ও পাঁচালীওয়ালারা এই ভাষায় গীত বাঁধিত। মোটামুটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বিষয়ী লোক ও আদালতের লোক এই তিনদল লোকের তিন রকম বাঙ্গালা ছিলো। বিষয়ীলোকের যে বাঙ্গালা তাহাই পত্রাদিতে

লিখিত হইত। এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাঙ্গালা শিখিলেই যথেষ্ট জ্ঞান হইত···। কথক মহাশয়েরা বহুকাল অবধি কথা কহিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সংস্কৃত ব্যবসায়ী, কিন্তু তাঁহারা যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ বিষয়ী লোকের ভাষা। কেবল জমকালো বর্ণনাস্থলে ও সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে পাণ্ডিত্য ভাষার অনুসরণ করিতেন।'[৮৭]

এই ফরাসী বহুল গদ্যরীতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন আদালতী ভাষা—সেই রীতিতে লিখিত 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। আর দেশী শব্দ, সংস্কৃত শব্দ ও প্রয়োজন স্থলে ফারসী শব্দ মিশিয়ে যে গদ্যরীতি, হর-প্রসাদ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন বিষয়ী লোকের ভাষা—সেই রীতিতে লিখিত হয়েছে 'লিপিমালা'।[৮৮]

রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্যে শুধু আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্যই নয়—বাক্য-বিন্যাসেও বাংলা গদ্যের কাঠামোকে ব্যাহত করেছে। "বাংলা গদ্যের এত কম বিপর্যয় নয়! যেকালে দিল্লীর তক্তে হোমাঙু বাদশাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদশাহের ওফাৎ হইলে হোন্দেস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হেমাঙু ছিলেন বৃহৎ গোষ্ঠী তাহার অনেক গুলিন সন্তান তাহাদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর বিস্তর ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়া-ছিলনা।"[৮৯]

এখানে অন্বয়ের কোনো প্রশ্নই উঠেনা। অবিরাম অবলীলাক্রমে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করছেন অথচ কোন ভাষায় লিখছেন এ হিতাহিত জ্ঞান যেনো তাঁর নেই। 'ভাষার মন্বন্তরে এ যেন এক নিতান্ত অরাজক অবস্থা'।[৯০]

রাম রাম বসু বাংলা ভাষায় যেমন 'অরাজকতা' এনেছেন তেমনি তৈরী করেছেন বিকৃতমূর্তি। 'তিনি নির্ভয়ে ফার্সি আরবী বাংলা সংস্কৃত শব্দ পাশাপাশি সাজাইয়া আদর্শহীন গদ্যের যুগে একটা কিছু খাড়া করিয়াছেন ফলে যে ভাষার উদ্ভব হইয়াছে তাহার বিরূপ বিকৃত মূর্তি দেখিয়া পরবর্তীরা সাবধান হইতে পারিয়াছেন।'[৯১]

আমরা আরো কিছু উদাহরণ দেবো—

ক সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এদেশে 'প্রতাপাদিত্য' নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গপাঙ্গরূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃমাতামহের শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর ২ অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপার্বিক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এজন্য যে মত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।[৯১]

খ ইহাতে বাদসাহ উহাকে সন্তুষ্ট হইয়া ওজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কেটা। পরে ওজির প্রতাপাদিত্যের দিগে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতাপাদিত্য ফের আদাব বাজাইয়া নিবেদন করিনে যাহাঁপনা গোলামের নাম প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশের যশহর চাকলা ও গত্রহের জমিদার বিক্রমাদিত্যের তরফ লোক। এ সমস্ত ওজির পুনরায় নিবেদন করিলেন বাদসাহের অনুমতিতে ওজির উহাকে খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন।[৯২]

এখানে ভাষা এক বিকৃত পিণ্ড হয়েছে। বাংলা গদ্যের এ এক নৈরাজ্য ও চরম অরাজকতা। ভাষার এ ভয়াবহ বিপর্যয় দেখেই সজনীকান্ত দাস বলেছেন—

"...রাম রাম বসু বিনা দ্বিধায় অনেক পরস্পরবিরোধী কর্তাকে একই ক্রিয়ার কাঁধে চাপাইয়াছেন, বহু ভিন্নধর্মী বাক্যকে এক জোয়ালে জুতিয়া দিয়া নানা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন; অর্থ বুঝিবার জন্য অনেক সময় আন্দাজে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া ও বিশেষণের যোগাযোগ ঘটাইতে হয়। দুঃসাহসী সেনাপতির মত তিনি বহুজাতীয় এবং বিজাতীয় শব্দকে যেমন তেমন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ভাষা-সমরে মহামার বাধাইয়া দিয়াছেন। তাহার ভাষা কোন নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির পর্যায়ে পড়েনা।"[৯৩]

'রাজা প্রতাপাদিত্যে' আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে বোধ হয় কেরী সাহেব প্রসন্ন হতে পারেননি তাই কেরী সাহবের প্রভাবেই 'লিপিমালায়' রামরাম বসুর গদ্যরীতিতে সংস্কৃতায়নে নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকাতে আছে—

"এ হিন্দোস্তান মধ্যস্থল বঙ্গদেশে কার্য ক্রমে এ সময় অন্যান্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধলোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের

সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চল ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেনা ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন তখনকার চলনভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েন এতদর্থে এ ভূমীয় যাবদীয় লেখা-পড়ার প্রকরণ এই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নামক পুস্তক রচনা করা গেল।"[৯৪]

লিপিমালায় রাম রাম বসু আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেননি এমনকি ভূমিকাতেও না। উইলিয়াম কেরীর গদ্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লিপিমালার গদ্যের উদাহরণ দিয়েছি। অনেকেরই ধারণা সংস্কৃতে রাম রাম বসুর ভালো জ্ঞান ছিলোনা---কিন্তু সংস্কৃতে ভালো জ্ঞান না থাকলেও সংস্কৃত রীতি সাহেবী বাংলা গদ্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন—এ বিষয়ে আর কোনো মতানৈক্য থাকতে পারেনা। নিম্নে আর একটি নমুনা—

"দাউদের এ দুর্নিত দেখিয়া পরিবার লোক যাহারা ২ সাতে ছিল ছিন্নভিন্ন হইয়া কে কোথায় গতি (গমন) করিল তাহার ঠেকানা থাকিল না [।] বেগম বিসন্নবদনা খিদ্যমানা অতিকাতরা হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। চিত্রের পুথলির ন্যায় দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ শোকেতে কাতরা হইয়া ধরণি তলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছেন। শান্তনা করে এমত কেহ নাই হানাথ ২ করিয়া বহুবিধি বিলাপীয় ক্রন্দন করিতেছেন।"

'হিতোপদেশ' ছাড়া গোলকনাথ শর্মার আর কোনো সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাঁর ভাষা সংস্কৃতানুসারী---কিন্তু তাঁর এ সংস্কৃতায়ন শক্ত ভিত্তির উপর নয়---এজন্য অনেক ক্ষেত্রেই জগাখিচুড়ি হয়েছে—'কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্বস্থামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এককালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদায় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া রাজা উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন

যে আমার পুত্রেরা অতিমূর্খ অতএব ইহাদের কি হইবে এমন পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্যান ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি কার্য্য যেমন কানার চক্ষুপীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত কিংবা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ কিন্তু মূর্খ পুত্র প্রতিপদে। বিদ্যাযুক্ত এবং সাধুদি একপুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে সিংহ। যেমন চন্দ্রা দ্বাদশ রজনীতে উদয় না হইলে কোটি ২ নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ করিতে পারেনা তাদৃশ একশত মূর্খপুত্র জানিবা এক সুপুত্রের তুল্য নহে। অপর যে ব্যক্তি অনেক দানও পুন্য করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীমান ও ধার্মিক হয়। ঋণকর্তা পিতা শত্রুমাতা অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা রূপবতী পুত্রা অপণ্ডিত। উচ্চ বা নীচ হউক গুণবান সকল স্থানে পূজনীয়।'[৯৫]

মূলত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা গদ্য চর্চা করেছেন কিন্তু গদ্যের কোনো আদর্শ ও ভিত তৈরী করতে পারেননি। বরং তাঁদের কন্টক্লিষ্ট সাধনা বাংলা গদ্যকে ভিত্তিচ্যুত ও বিপথগামী করেছে। আর 'এই সকল গ্রন্থে রচনারীতির প্রধান দোষ হইতেছে (১) দূরান্বয়, (২) পেরেনথিসিস-এর অত্যধিক ব্যবহার, (৩) এবং ছেদ চিহ্নের অল্পতা। তখনকার দিনের সাধুভাষার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লক্ষণীয় হইতেছে এই আটটি—(১) একাধিক বহুবচন বিভক্তির ব্যবহার, যেমন—স্ত্রীগণেরা, ভৃত্যবর্গেরা, পাঞ্চজন যক্ষেরা, ইত্যাদি ; (২) তৃতীয়া-সপ্তমীতে'এতে' বিভক্তির ব্যবহার, যেমন হাতেতে, ঘরেতে ইত্যাদি ; (৩) ক্রিয়াযোগে চতুর্থীর স্থানে কে বা রে বিভক্তির ব্যবহার, যেমন—বিপরীত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল, আমি প্রসন্ন আছি তোকে, রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া, আমারেও উচিত নহে এখানে থাকিতে, ইত্যাদি ; (৪) তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে 'করণক' শব্দের প্রয়োগ, যেমন—ঐরাবত করণক পার্বত বিদার করিয়া দিলে, হংস হত হইল পথিক করণক, ইত্যাদি ; (৫) ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত বহুবচনের দিগ বিভক্তির যোগ, যেমন—তাহারদিগের, রাজার দিগকে ইত্যাদি ; (৬) মাতৃ প্রত্যয়জাত শব্দের অসমাপিকা অর্থে প্রয়োগ, যেমন—চরত, আচরত. হয়ত ইত্যাদি (৭) সামান্য অথবা নিত্যবৃত্ত অতীতের স্থলে অসম্পন্ন বর্তমান কালের ব্যবহার, যেমন—পথিক প্রকাশ করিয়া কহিতেছে ইত্যাদি (৮) অনবা ইবা প্রত্যয়ান্ত শব্দে সপ্তমী বিভক্তির যোগ করিয়া তাহা ইলে প্রত্যয়ান্তে অসমাপিকার অর্থে ব্যবহার, যেমন—হইবাতে, আইসনে, পাওনেতে ইত্যাদি।'[৯৬]

মূলতঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের সামনে বাংলা গদ্য-রীতির কোনো সুনির্দিষ্ট রীতি বা মৌলধারার সাথে যোগসূত্র ছিলো না। কেরী সাহেবের নির্দেশেই তাঁরা কাজ করেছেন। মল্লবীরের মতো বাংলা গদ্যকে নিয়ে যে কসরৎ করেছেন—এতে শিল্পধর্ম নয়—বরং বাংলা গদ্যের এক একটি বিকৃত পিণ্ডই তৈরী করেছেন। দৃষ্টান্ত—'নিজ নিজ অঞ্চলের প্রচলিত সংলাপরীতি বা তাহাদের কর্মজীবনে অর্জিত বিশেষ মানসরুচি ও প্রবণতাকে সম্বল করিয়াই তাহাদের নির্বাচিত বিষয়সমূহের সহিত মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনভ্যস্ত ভাষায় নূতন বিষয়ের যে প্রকাশ দুরূহতা, অনির্দিষ্ট ছাঁচে অবাধ্যভাবকে ঢালাই করার যে গলদঘর্ম চেষ্টা তাহাকে প্রায় মল্লযুদ্ধের পর্যায়েই ফেলা যায়। এই দুঃসাধ্য কাজে যাঁহারা অনুবাদের বিশেষতঃ সংস্কৃত হইতে অনুবাদের যষ্টি লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন পদক্ষেপ অনেকটা সহজ হইয়াছে। যাহারা উর্দ্দু, হিন্দি, ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়াছেন তাহারা নির্ভর-যোগ্য আদর্শের অভাবে হোচট খাইয়াছেন।'[৯৭]

**নয়**

আমরা আগেই আলোচনা করেছি বাংলা গদ্যরীতির 'সাধুভাষা' ও 'আলাপের ভাষা' সম্বন্ধে রামমোহন যেমন সচেতন ছিলেন তেমনি মৃত্যুঞ্জয়ও সচেতন ছিলেন 'সাধুভাষা' ও 'লৌকিক ভাষা' সম্বন্ধে। কিন্তু সাহত্যক্ষেত্রে এ 'আলাপের ভাষা' ও 'লৌকিক ভাষা'কে তারা বিশেষত স্বীকৃতি না দিয়ে সংস্কৃত রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

বাংলা ভাষা যে সংস্কৃত হতে আলাদা প্রকৃতির তা তিনি ভালো করে বুঝেই গৌড়ীয় ব্যাকরণ লিখেছেন। কিন্তু তিনি লিখেছেন সংস্কৃত রীতিতে। তাঁর জীবনের স্ববিরোধিতার দিকে তাকালে আমরা বিস্মিত হই। এদেশের স্বাধীনতার কথা যেমন ভেবেছেন তেমনি নীলচাষ এ দেশের কৃষকদের খুব উপকার হচ্ছে এ সার্টিফিকেটও তিনিই দিয়েছেন। তাঁর এ স্ববিরোধিতার একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী—'তাহার এই নিয়ম ছিলে যে, তিনি প্রাতে দেশীয় প্রথা অনুসারে আসন বা পিঁড়িতে বসিয়া মাছ ভাত খাইতেন; রাত্রে বন্ধুগণ সমভিব্যবহারে টেবিলে বসিয়া ইংরেজী রীতিতে খানা খাইতেন।' [৯৮]

আমাদের দুঃখ এতোবড়ো প্রতিভা বাংলা ভাষার রীতিও প্রকৃতি বুঝেও সংস্কৃত রীতিতে লিখেছেন। আমরা জানিনে শব্দের দীনতায়

না যুগের প্রভাবে এমন হয়েছিলো। কারণ 'রামমোহন যখন এদেশে তখন পণ্ডিতদের কাছে বাংলায় কোন স্থান নেই। সাধুজনের যোগ্য বাংলা রচনার নিয়ম কানুনটি পর্যন্ত তৈরী করে তাঁকে পণ্ডিতদের কাছে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হ'ল।'''তারপর যে সব পণ্ডিত বাংলা ব্যবহার করলেন তাঁদের ভক্তি ছিল সংস্কৃতেরই উপরে বাংলাকে তাঁরা 'নোকর-চাকরের' মতন ব্যবহার করেছেন'''। এইসব নোকর চাকরদের উপরে তাঁরা বৃহৎ কর্মের ভার কখনও দেননি।'[৯৯]

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন 'রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন'।[১০০] কিন্তু একথাও ঠিক যে, বাংলা ভাষার প্রকৃতি জেনেও একে তিনি মৌল-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করে সংস্কৃত রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় অন্ততপক্ষে বাংলা গদ্যরীতিতে নয়। অর্থাৎ এখানে তাঁর অবদান ক্ষীণতম।

অনেকে রামমোহনের গদ্যরীতির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন রামমোহনের গদ্যরীতি ব্যর্থ হলো কোনো এবং পরবর্তী কালের বাংলা গদ্যে তার কোনো প্রভাব নেই কেনো। আমাদের ধারণা বাংলা ভাষা সংস্কৃত নয় জেনেও রামমোহন সংস্কৃত বাক্যরীতিতে গদ্য লিখেছেন—'কিন্তু তাহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য আমরা যাহাকে মডার্ণ প্রোজ বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।' [১০১]

উদাহরণ স্বরূপ আমরা কঠোপনিষৎ-এর অনুবাদের আশ্রয় নেবো—

প্রার্থনীয় যে কর্ম্মফল যে অনিত্য, আমি তাহা জানি, যেহেতু অনিত্য বস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে নিত্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রাপ্ত হয়েন না; কিন্তু অনিত্যবস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে অনিত্য বস্তু যে স্বর্গাদি ইহা প্রাপ্ত হয় এমৎ জানিয়াও আমি অনিত্য বস্তু দ্বারা স্বর্গফল সাধন যে অগ্নি তাহার উপাসনা করিয়া বহুকাল স্থায়ী যে স্বর্গ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।[১০২]

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, 'রামমোহনের গদ্যরীতি মূল সংস্কৃত গদ্যরীতির আদর্শে গঠিত। সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎপত্তি, শাস্ত্রানুবাদ ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে অবিরাম শাস্ত্রদ্বন্দ্ব—এই তিনের ফলে তাঁর বাংলা ভাষা সংস্কৃতানুসারী হয়ে উঠেছে।'[১০৩] রামমোহন অনেক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু মহাপণ্ডিত ছিলেন সংস্কৃত, ইংরেজী ও আরবী-ফারসী ভাষায়। আর বাংলা গদ্য লিখতে গিয়ে তিনি এক চরম দ্বন্দ্বে পড়েছিলেন সংস্কৃত ও ইংরেজী রীতি নিয়ে। এ সংকট তখন এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে বাংলা গদ্যের বিপর্যয় এনেছিলো। রামমোহন এতোবড়ো প্রতিভান ও ভাষা পণ্ডিত হয়েও এ সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এ সংকটের চিত্র আঁকতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'খাঁটি বাঙ্গালা আমদিগের বড় মিঠে লাগে, ভরসা করি, পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাইনা যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোনো উন্নতি হইতেছেনা বা হইবেনা। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্নভাষার অনুকরণমাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্তমাত্র না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে।···একদিকে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত "ধৃষ্টদ্যুম্ন পাড় বিপাক মলিম্লুচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছেনা, আর একদিকে ইংরাজির ভরাগাঙ্গের বেনো জল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে।'[১০৪] রামমোহনও এ দোটানায় পড়ে সংস্কৃতের উজানে তরী বেয়েছেন।

রামমোহন বাংলা গদ্যকে যুক্তি, তর্ক ও বিচার বিশ্লেষণের বাহন করলেও আড়ষ্টতামুক্ত এবং তীক্ষ্ণ গতিশীল করে তুলতে পারেননি। ভবানীচরণ বাংলা গদ্যে 'ক্ষিপ্রতা' ও সরসতা আনেন। সত্যি কথা বলতে কি ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক শাণিত গদ্যে প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি বাংলা গদ্যের নিজস্বতার ধ্বনিও তাঁর গদ্যেই অনুরণিত।—

"দৈনন্দিন জীবনের সহিত তাল রাখিয়া সরল ও সহজবোধ্য বাঙ্গালা গদ্য গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সংবাদ পত্র একটি মুখ্য সাধন হইয়া দাঁড়াইল। একদিকে ইংরেজী হইতে যেমন, তেমনি অন্যদিকে সংস্কৃত হইতেও

অনুবাদের পথ ধরিয়া বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রসার ও শক্তি উভয়ই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৪০ সালের পূর্বেই এই সমস্ত সমবেত চেষ্টার ফলে বাঙ্গালায় একটি কার্যকরী ও শক্তিশালী গদ্য শৈলী স্থাপিত হইয়া গেল। এই বিষয়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঙ্গালার প্রথম গদ্য স্টাইলিস্ট অর্থাৎ শক্তিশালী পদ্ধতির প্রবর্তক বলিতে পারা যায়।"[১০৫]

ভাষার নিজস্বতার এবং ব্যঙ্গপ্রধান গদ্যের প্রথম স্টাইলিস্ট শিল্পী তিনি এবং এ কৃতিত্ব তাঁকে দিতেই হবে।

দশ

"বঙ্গ সাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বার উদঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"[১০৬]

বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী গদ্য লেখকেরা বাংলা গদ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করেছেন সত্য কিন্তু মৌলপথ আবিষ্কার করতে পারেননি। বাংলা গদ্যের যে একটা স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিক স্টাইল আছে এবং এ পথেই তার মুক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে সাগরপথে যাত্রা। এরই আবিষ্কারক ও মহাস্থপতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের আগে বাংলাগদ্যে কোনো শিল্পপ্রাণ ছিলোনা। বিষয় বস্তুকে প্রকাশ করাই ছিলো তাদের কাছে বড়োকথা। শক্তিমান শিল্পী বিদ্যাসাগরের হাতে গদ্য দৈনন্দিন জীবনের বৈষয়িক জ্ঞানের তুচ্ছতা হতে মুক্ত হয়ে মাধুর্য ও ধ্বনি-তরঙ্গময়তা ও পদলালিত্যে মহৎভাবের বাহন হয়ে শিল্পরূপ লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রেনেসাঁসের আলোকসম্পাতে যে জীবন পিপাসা ও আত্ম জিজ্ঞাসা এবং চিত্তমুক্তি ও আত্মমুক্তির উদগ্রবাসনা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলো—একে বাণীরূপ দেবার বাহন রূপে গদ্যকে উপযুক্ত করে তুলতে পারেননি কেউ—রামমোহন এর ক্ষীণ আভাস। বিদ্যাসাগরের গদ্যে আমরা দেখি যুগের চিন্তা ও চেতনা এবং সমাজ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন তথা নবযুগের চিন্তার তরঙ্গ মুখরতা।

'আসলে বিদ্যাসাগরের ভাষাঘটিত সব সাফল্যের মূলে আছে বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস। ইংরেজী ভাষাভঙ্গীর আনুগত্য তিনি মানেননি এবং সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর ঘনিষ্ট অনুরক্তি সত্ত্বেও বাংলা যে পৃথক ভাষা এ সত্য তিনি বুঝেছিলেন। পূর্বের কোনো লেখকের রচনা থেকে তিনি এই আদর্শের খোঁজ পাননি, সাধারণ মানুষের কথাবার্তার ভাষারীতি অনুধাবন করেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন।...কথারূপই ভাষার আত্মা তাঁকে ভিত্তি না করে কোনো লেখ্যরূপই সফল হতে পরেনা এই বোধ তাঁর ছিলো। বাঙালীর মুখের ভাষার বৈশিষ্ট্যকে তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন।'[১০৭]

কেরী প্রমুখ ইংরেজ সাহেব ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ বাংলা গদ্যের প্রাণ ধারার অব্যাহত গতিকে অস্বীকার করে মল্লবীরের মতো ব্যায়াম করে বাংলা গদ্যের এক কৃত্রিম রীতি গড়ে তুলেছিলেন —আর বিদ্যাসাগরের ভাষারীতি গড়ে উঠেছে—বাংলা গদ্যের প্রাণস্পন্দনের সাথে একাত্ম হয়ে। বাংলা গদ্য তখনও ভালো রূপে সাহিত্যিক গদ্যে রূপ পায়নি বলে—এর মৌলধারার অনুসন্ধান করেছেন কথ্য ভাষায় ও লোকজ ভাষায়—এবং একেই তিনি মার্জিত ও পরিশীলিত করে শিল্পরূপ দিয়েছেন। নিম্নের উদাহরণে আমাদের এ বক্তব্য স্পষ্ট হবে—

"এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, তারানাথ তর্কবাচস্পতি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত। আজকাল শুনিতেছি তাঁর যত বড় নাম, যত ধূমধাম, তত বিদ্যা ও জ্ঞান নাই। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, বহু বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া, এক খানা বহি লিখিয়াছিলেন। তর্কবাচস্পতি খুড়া তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় একখানা বহি বাহির করিয়াছেন। সেই বহি পড়িয়া, সবাই বলিতেছে, এবার তারানাথের দফারফা হয়েছে। সকল লোকই অবাক হয়েছে ও কহিতেছে, তাইত হে। তারানাথটা কি? কিসের জারি করিয়া বেড়ায়।" (অতি অল্প হইল)

"খুড়র আমার, দুর্ভাগ্যক্রমে, ঠিক সেইরূপই ঘটিয়াছে, পেটে নানা বিদ্যা বোঝাই লইয়াছেন, অদ্যাপি সাজাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বোধহয় এ যাত্রা এই ভাবেই গেল। এদিকে নিকট হয়ে এল, আর কবে সাজাইবেন

"...সংস্কৃত শব্দ কামধেনু বটে; কিন্তু খুড়া, কামধেনু দোহন না করিয়া, কমধেনু বধ করিয়াছেন।" (আবার অতি অল্প হইল)

গদ্য লিখতে গিয়ে বিদ্যাসাগর নতুন পথ অবলম্বন করেছিলেন। শিষ্ট কথ্য ভাষাকেই তিনি মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। ছোট হোক বড়ো হোক—পৃথিবীর সব ভাষারই একটা মৌল উৎস ও ধারা আছে। এ সত্যটিকে উপেক্ষা করে যাঁরা ভাষাকে অন্য ভাষার কৃত্রিম ছাঁচে পুড়ে দিতে চান তাঁদের দ্বারা ভাষার কেনো উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিতো হয়ই না—বরং ভাষা একটা কৃত্রিম ও জটিল জড়পিণ্ড হয়ে আবর্জনায় পরিণত হয়। সচেতন শিল্পী ভাষার এ মৌল ধারাটি খোঁজেন, ভগীরথের মতো পাথর কেটে গিরি কান্তার পার করিয়ে—সমস্ত উপল-খণ্ডকে উপরিয়ে ফেলে গভীর স্রোত প্রবাহ আনেন। কারণ তাঁরা ভাষার প্রকৃতি ও সঠিক স্পন্দন অনুভব করতে পরেন এবং ভাষার প্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণও করেন। বিদ্যাসাগর তাই করেছেন, ধ্বনি, শব্দ, ছন্দ ও বাকরীতিকে বিচার বিশ্লেষণ করে বাংলা গদ্যের মৌল প্রকৃতি ও রহস্য তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। বিচার বিশ্লেষণ করে তিনিই প্রথম দেখিয়ে দেন যে, বাংলা গদ্য সংস্কৃতের মতো দীর্ঘ সমাসযুক্ত প্রলম্বিত ও বিস্তারিত নয়, তা কয়েকটি বাক্যাংশে একটি বাক্য। এ বাক্যাংশগুলো আবার শ্বাসপর্ব ও সার্থপর্বের সমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক বাক্যের যেমন আলাদা একটি ধ্বনি তরঙ্গ আছে—ঠিক বাক্যের ভেতর শ্বাসপর্ব ও সার্থপর্বও এমনি ভাবে ক্রিয়াশীল।

বিদ্যাসাগরের মানসিকতায় এ বোধটিও ক্রিয়াশীল ছিলো যে, 'এদেশে যখন একটি বিশেষ ভাষা প্রচলিত আছে, তখন নিশ্চয়ই তার একটা বিশিষ্ট পদবিন্যাস রীতিও আছে। ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে হলে, যে পদ্ধতি বা কৌশলই অবলম্বন করা হোকনা কেন সেই বিশিষ্ট পদবিন্যাস রীতিটির উপরই তার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। তিনি তাই করেছিলেন। শুধু তা'ই করেননি, সেই বিশিষ্ট পদবিন্যাস রীতিটিকে প্রচুর পরিমার্জনা করে তার মধ্যে ঔৎকর্ষের চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়েছিলেন। এই ভাষা পরিমার্জনায় ইংরেজী বিরামচিহ্নের ব্যবহার করে তিনি কেবল পাঠক সাধারণের গ্রন্থ পাঠের সুবিধাই করেননি, আপন সংস্কারমুক্ত হৃদয়ের গভীরতা ও সুশিক্ষিত মননের তীক্ষ্ণতার পরিচয় ব্যক্ত

করে তাঁর আপনার অনন্যসাধারণ প্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিককেই আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন'।১০৮

বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি যেমন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন---তেমনি লোক মুখের অসংস্কৃত শব্দও সার্থকভাবে ব্যবহার করে ভাষার শ্রীসাধন করেছেন। তৎসম ও দেশী শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য বাড়িয়েছেন। 'সংস্কৃত শব্দ ও লোকমুখের শব্দের যথাযথ সমন্বয়ে ভাষা দেহে যে স্বাস্থ্য ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, বাংলা ভাষায় যা হচ্ছে তার প্রবল ও আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত বিদ্যাসগরের কলমে।'১০৯

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

১ বাংলা ভাষাকে পূর্ব প্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভাব হইতে মুক্ত করিয়া,
২ তাহার পথগুলির মধ্যে অংশ যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া,
৩ বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে,
৪ তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

গদ্যকে বিদ্যাসাগর কিভাবে মার্জিত, পরিশীলিত ও শিল্পিত করে তেলেন এ প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন---

১ গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া,
২ তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া,
৩ সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া
৪ বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।১১০

'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের সর্বত্রই বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদ্যাসাগরের নিন্দে ও প্যারীচাঁদের প্রশংসায় মুখর। তাঁর মূল বক্তব্য হলো সংস্কৃতানুকারিতা ও সংস্কৃতপ্রিয়তার ফলে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে শুষ্ক ও নীরস করে তুলেছেন আর প্যারীচাঁদ সেখানে কুঠারাঘাত করে রসধারা সৃষ্টি করেছেন। "এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে সুপরিচিত হইয়া রহিলেন। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথম এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজীতে সুশিক্ষিত, ইংরেজীতে

প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্য গ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় কথা সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেইদিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবন বারি নিষিক্ত হইল।"[১১১]

সংস্কৃতানুকারিতা, সংস্কৃতানুসারিতা ও সংস্কৃতপ্রিয়তার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর অভিযোগ করলেও তাঁর গদ্যের কাঠামোই কিন্তু বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের ভিত্তিকে কেন্দ্র করে স্থাপিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও অন্যান্য গ্রন্থে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতি শাশ্বতভাবেই উপস্থিতি ঘোষণা করছে। আমরা বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য হতে উদাহরণ নিলেই বুঝতে পারবো কার গদ্যরীতিতে 'সংস্কৃতানুকারিতা' ও 'সংস্কৃতপ্রিয়তা' বেশী।

১　লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যা! এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নিলীমায় অলঙ্কৃত, অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বন পাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে। (বিদ্যাসাগর)

২　অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দুর গমন করিলে ঘোটক চরণে কোন কঠিন দ্রব্য সংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময়ে একবার বিদ্যুত প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র)

দু'টি অংশেই 'সংস্কৃতপ্রিয়তা' সমান কিন্তু কোনটিই 'সংস্কৃতানুকারি' নয়, সংস্কৃত শব্দগুলি এখানে বাংলা পদবিন্যাস রীতিকেই অনুকরণ করেছে। তবু যদি দোষ বিচার করতে হয়, বলব দোষ বঙ্কিমচন্দ্রেরই।

প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

'বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বিদ্যাসাগরী ভাষা নিন্দার যোগ্য, কেননা তা সংস্কৃত-বহুল ও সংস্কৃতানুসারী, আর টেকচাঁদের ভাষা প্রশংসার, কেননা, তা কথোপকথনের ভাষা এবং প্রচলিত ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে টেকচাঁদ ফারসীবহুল রীতিকে পরিত্যাগ করে বিদ্যা-সাগরের সংস্কৃতবহুল রীতিকে গ্রহণ করেছেন। বঙ্কিমের বিচারে যেমনি হোক কালের বিচারে বিদ্যাসাগর নিজের অনুকূলে রায় পেয়েছেন। তাঁর সাহিত্যিক বুদ্ধি বলেছিল যে, বাঙালীর চিত্ত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের প্রচুরতর অমদানী অবশ্যম্ভাবী। বাঙালীর মনকে গ্রাম্যতার ঊর্ধ্বে তুলে বাংলা ভাষাকে যদি অমর ভাব জননীরূপে মানব সভ্যতার ধাত্রীগণের মধ্যে স্থান করে দিতে হয় তবে বহু মনীষীর অনুশীলনপুষ্ট সংস্কৃতের দারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কাজেও তাই হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সময় থেকে সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা বাড়তির মুখে চলেছে। আর যদি 'সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুসারিতা' দূষণীয় হয় তবে বঙ্কিম-চন্দ্রের নিজের অপরাধের মাত্রাও বড় কম নয়—।'[১১২]

বঙ্কিমচন্দ্র বারবার বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃতপ্রিয়তা', সংস্কাতানুকারিতা ও 'সংস্কৃতানুসারিতার' বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। কিন্তু এ সমস্ত অভিযোগে বিদ্যাসাগরের চেয়ে বঙ্কিমই বেশী দোষী—। বিদ্যাসাগরের কানেও বঙ্কিমের এ সমস্ত অভিযোগ গিয়েছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র যে বিদ্যা-সাগরের চেয়ে বেশী সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন এর প্রমাণ বিদ্যা-সাগরই দেখিয়ে দিয়েছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বৈঠকী আলাপে আমরা জানতে পারি—

'বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—বারাসোতে কালীকৃষ্ণ মিত্রের বাড়ি একদিন কথা উঠিয়াছিল। তাহার পর বলিলেন, 'ছাপাখানায় 'এম' কাহাকে বলে তুই জানিস?' আমি বললাম—না। তিনি আমাকে 'এম' বুঝাইয়া দিলেন, তারপর বলিলেন—কালীকৃষ্ণ মিত্র বঙ্কিমের একখানা ও আমার একখানা বই আনিলেন। আমার বইয়ে যতগুলি 'এম' ছিল বঙ্কিমের বইয়েও ততগুলি 'এম' লইলেন। তারপর কথা গুণিতে লাগিলেন। আমার সেইটুকুতে ৫৫টা সংস্কৃত কথা ছিল আর বঙ্কিমের ৫৬ টা। আমি কালীকৃষ্ণ বাবুকে দেখাইয়াছিলাম—এইত, কার সংস্কৃত বেশী দেখ।"[১১৩]

সুকুমার সেনের মতে 'বিদ্যাসাগরের রচনা রীতি অবলম্বন করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্য লেখা শুরু করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনাভঙ্গি মোটামুটি হিসাবে বিদ্যাসগরী পদ্ধতি আশ্রয়ী।···'মৃণালিনী'র মধ্যেও বিদ্যাসাগরী এবং স্বকীয় রীতির মিশ্রণ পাই।·· 'ক্ষমতাশালী লেখকের হাতে ধীর গম্ভীর বিদ্যাসগরী রীতি যে কতটা উৎকর্ষ পাইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই 'কপালকুণ্ডলায়'। ····বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন উপন্যাসে এমন অংশ দুর্লভ নয় যাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে বিদ্যাসাগরের লেখার মত বোধ হইবে না।'···

এরপর ডক্টর সেন 'রজনী' হতে একটি উদাহরণ দিয়েছেন—

'কখন দেখিতাম আকাশমার্গে অশনি সমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চক্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল; গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল; আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া, দাহ্যমানবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ জ্যোতির্ম্ময় কাণ্ডরূপধর দেবযোনির মূর্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বর পথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে।'[১১৪]

বিদ্যাসাগর সারাজীবন একই রীতিতে গদ্যচর্চা করেননি। একজন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর মতোই তিনি ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। গ্রন্থের প্রতিটি সংস্করণেই তিনি ভাষা পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করেছেন। তাঁর গদ্য একটি মধুর ছন্দস্রোত নিয়ে উত্তরোত্তর জটিলতা, আড়ষ্টতা, দুর্বোধ্যতা এবং এমনকি সাধুভাষা হতে সংস্কৃতের সম্বন্ধটি পর্যন্ত কাটিয়ে একান্তভাবেই আধুনিক চলতি ঢঙ-এ এসে পরিপূর্ণ শিল্পমর্যাদা পেয়েছে। 'বিষয়ানুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।'[১১৫] বিদ্যাসাগরের গদ্য-গদ্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ উক্তি একান্তভাবে সার্থক।

"তাঁর 'সীতার বনবাস' ও 'শকুন্তলা' যেমন 'বিষয়ানুসারেই' কিছু পরিমাণে সংস্কৃতবহুল, তেমনি 'বিষয়ানুসারেই' 'বিধবা বিবাহ' সংক্রান্ত বিতর্ক পুস্তকগুলো লঘু-চপল। 'সীতার বনবাস' ও 'শকুন্তলা'র ভাষার গতি যদি গজেন্দ্রগমন হয়, বিতর্ক পুস্তিকাগুলির গতি তবে টাট্টু ঘোড়ার

চাল। তার চলার বেগে চার পায়ে লেগে দেশী ভাষার লোষ্ট্র খণ্ডগুলোর যে কি রকম প্রবল আঘাত করতে পারে তা জানে 'খুড়ো মশাই'! আবার বিষয়ানুসারেই আত্মচরিতের গতি মন্থর, না হয়ে উপায় কি, তখনকর দিনে বীরসিংহ থেকে কলকাতা পদব্রজে আসতে যে অনেক সময় লাগতো। আত্মচরিতের ভাষায় কোথায় "সংস্কৃতানুকারিতা"? এ ভাষা লেখকের মতেই মাইলেস্টোন লক্ষ্য করতে করতে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে চলেছে, মেঠো পথে মেঠো ভাষা---অথচ কেমন পরিচ্ছন্ন! আর 'প্রভাবতীসম্ভাষণ! ভাষা এখানে অশ্রুভারে মন্থর, বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠ, ঘন ঘন কমা, সেমিকোলনে বিশ্রাম সন্ধান করে, একটি সরলহৃদয় শিশুর অকাল তিরোভাবে একটি সরল হৃদয় প্রৌঢ়ের স্বগত এই শোকোচ্ছ্বাসটি বাংলা গদ্য-কাব্যে লিখিত শ্রেষ্ঠ শোক-কাব্য। এই রচনায় সংস্কৃত শব্দ অধিক কি অল্প তা বিচারে বসলে বুঝতে পারা যায়, পড়বার সময় নয়। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' বাংলা মন্দাক্রান্তা গদ্যকাব্য।"[১১৭]

তাঁর ভাষা যেমন 'বিষয়ানুসারী' তেমনি 'রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং সুষ্ঠতা—এ গুণেও সমৃদ্ধ। তার গদ্যরীতির বিবর্তনের চিত্রটি তুলে ধরলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে—

১ যমুনা তীরে জয়স্থল নামে এক নগর আছে। তথায় কেশব নামে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের মধুমালতি নামে এক পরমা সুন্দরী দুহিতা ছিল। কালক্রমে মধুমালতি বিবাহ যোগ্যা হইলে, তাহার পিতাও ভ্রাতা উভয়ই উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণে তৎপর হইলেন।

২ বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করে; তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম্ম করিতে পারিবে, স্বয়ং অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না, এবং বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। কোনও কোনও বালক এমন হতভাগ্য যে, সর্ব্বদা অলস হইয়া সময় নষ্ট করিতে ভালবাসে; পরিশ্রম করিতে হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস এবং বড় হইয়া ধনোপার্জ্জন, কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং যাবজ্জীবন ক্লেশ পায় এবং চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে। (বোধোদয়)

৩ কয়ৎক্ষণ পরে শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং শকুন্তলার শরীর হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, "বাছা! শুনিলাম আজি তোমার অসুখ হইয়াছিল, এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে?" শকুন্তলা কহিলেন, "হ্যাঁ পিসি আজি বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি।" তখন গৌতমী কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া শকুন্তলার সর্ব্বশরীরে সেচন করিয়া কহিলেন, "বাছা! সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবিনী হয়ে থাক।" অনন্তর লতামণ্ডপে অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া কহিলেন, "এই অসুখ, তুমি একলা আছ বাছা! কেউ কাছে নাই।" শকুন্তলা কহিলেন, "না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল; এই মাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল।" তখন গৌতমী কহিলেন, "বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ন হয়েছে এস কুটিরে যাই।" শকুন্তলা অগত্যা তাহার অনুগামিনী হইলেন। রাজাও 'আর আমি প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করি', এই বলিয়া শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। (শকুন্তলা)

৪ সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া আতপনিবারণ করেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেইসকল গিরি তরঙ্গিনী-তীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বপূর্বক, এই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রাম সুখ সেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন।

৫ ঙ্কটলেণ্ডের অন্তঃপাতী ডাণ্ডী শহরে, এক দরিদ্র নারী বাস করিতেন। তাহার একমাত্র শিশু সন্তান ছিল। বৃদ্ধা অনেক কষ্টে ও পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জন করিয়া, নিজের ও পুত্রের ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিতেন।

লেখাপড়া না শিখিলে মূর্খ্য হইবে ও চিরকাল দুঃখ পাইবে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি লেখাপড়া শিখিবার নিমিত্ত পুত্রকে বিদ্যালয়ে

পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রও আন্তরিক যত্ন ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল। এই সময়ে তাহার জননী পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইলেন। তাহার অবয়ব সকল অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তিনি শয্যাগত হইলেন। (আখ্যান মঞ্জুরী)।

৬ বৎসে! আমি যে তোমায় আন্তরিক ভালবাসিতাম, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান আর তুমি, তুমি যে আমায় আন্তরিক ভালবাসিতে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি, তোমায় অধিকক্ষণ না দেখিলে, যারপর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতাম। তুমিও আমায় অধিকক্ষণ না দেখিতে পাইলে যারপর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতে। এবং আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আসিব, আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, অনুক্ষণ সেই অনুসন্ধান করিতে। এক্ষণে, এতদিন তোমায় দেখিতে না পাইয়া, আমি অতি বিষম অসুখে কাল হরণ করিতেছি। কিন্তু এতদিন আমায় না দেখিয়া, কিভাবে কাল যাপন করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছিনা। বৎসে যদিও তুমি নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া, এ জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়াছ এবং আমার নিমিত্ত আকুলচিত্ত হইতেছ কিনা জানিতে পারিতেছিনা, আর হয়ত এতদিনে আমায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছ। কিন্তু আমি তোমায় কস্মিনকালেও, বিস্মৃত হইতে পারিবনা। (প্রভাবতী সম্ভাষণ)

বিদ্যাসাগরের চলিত রীতি চঞ্চল-চপল গতিতে কতো অনায়াসে চলতে পারে নিম্নের উদ্ধৃতিতে আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে—

৭ ···আমার পরিচয় শুনিলে আপনারা চমকিয়া উঠিবেন। কিন্তু অন্যমনস্ক হইয়া এ পর্যন্ত পরিচয় দিতে পারি নাই। এ জন্য যদিও আপনারা, সাহস করিয়া, মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারুন, মনে মনে বিরক্ত হইতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। বোধকরি পরিচয় দিতে বিলম্ব করা আর কোনও মতে, উচিত হইতেছে না। যেরূপ দেখিতেছি তাহতে আমি কে ও কি ধরনের জানোয়ার, তাহা জানিবার জন্য, আপনারা ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। যদি বলেন, তবে পরিচয় দিতে এত বিলম্ব ও আড়ম্বর করিতেছেন কেন? তাহার কারণ এই, পরিচয় দিলেই ভুল

ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহা অপেক্ষা চালাকি ও গোলমাল করিয়া যতক্ষণ আপনাদিগকে ফাঁকি দিতে পারি, সেই লাভ, সেই বাহাদুরী। যদি বলে, লোককে ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রের কর্ম্ম? এ বিষয়ে বক্তব্য এই আপনারা ভদ্র কাহাকে বলেন, তাহা আমি জানিনা। অভিধানে ভদ্র শব্দের যে অর্থ শিখিয়াছিলাম, সে অর্থের ভদ্র শব্দে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, এরূপ লোক দেখিতে পাই না।'

স্বরচিত 'বিদ্যাসাগর চরিতে' বিদ্যাসাগরের ভাষা যে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতিতে এবং সহজ সরল ঢঙে কতো যে শিল্পোত্তীর্ণ রূপ নিয়েছে এ উদ্ধৃতি দিয়েই তাঁর ভাষার ক্রম বিবর্তনের আলোচনা শেষ করবো—

৮ 'প্রথমবার কলিকাতা আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন? তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া হাস্য মুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নম মাইলষ্টোন। আমি বললাম, বাবা, মাইলষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইংরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ ক্রোশ; ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা আছে; উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে। এই পরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ সারে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন। (বিদ্যাসগর চরিত)।

'বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত ও গঠিত বাংলা ভাষাই অমাদের মূলধন। তাহারই উপার্জিত সম্পত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি।'[১১৭] বাংলা ভাষার তিনি ভগীরথ—তাঁর গদ্যরীতিতেই বাংলাভাষা সার্থক, শোভন ও সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর মনীষা ও প্রতিভার প্রকর্ষণেই বাংলা ভাষা সত্যিকার বাংলা ভাষায় রূপ নেয় এবং ভবিষ্যতের রাজপথ তৈরী হয়।

'বিদ্যাসাগরের ভাষারীতির আর একটি বড়োগুণ এর বিস্তৃতি ক্ষমতা। এ ভাষারীতি গ্রহণ করে যে কোনো একজন মহৎ ভাষা শিল্পী হতে

পারেন। এবং অন্যের প্রভাবে গলিয়ে নাগিয়ে বা আত্মস্থ না হয়েও স্বীয় ভাষা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষারীতি অনুসরণ করলে ক্ষুদ্রতর বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে ওঠে ''রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির প্রভাব সম্বন্ধে একথা আরো বেশী প্রযোজ্য। কিন্তু বিদ্যাসাগরের রীতির অনুসরণে কোনো ক্ষুদ্রতর বিদ্যাসাগর হয়ে উঠেছে বলে জানিনে। এ রীতিটা সার্বজনীন পথের মতো, যে কেউ চলতে পারে এবং যথসময়ে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে যাবার ও সম্ভাবনা।'[১১৮]

বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতিই যে সাহিত্যিক গদ্যরীতির সার্থক ও স্বাভাবিক গদ্যরীতি তা আজ আর কোন দ্বিমতের অবকাশ রাখেনা। সমকালীন ভদ্র সমাজের কথ্য ভাষার চঙটা আত্মস্থ করেই সেদিনকার প্রচলিত সাধু ভাষার মধ্যে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের অনন্ত সম্ভাবনাময় ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এবং এ ভাষা অতীব সহজেই ভদ্র সমাজের মুখের ভাষা 'চলিত ভাষা' সৃষ্টি করেছে। আজ আধুনিক শিক্ষিত ও নাগরিক বিদগ্ধ বাঙ্গালী আলাপ আলোচনায় যে ভাষা ব্যবহার করে তা কোন আঞ্চলিক উপভাষা নয় তা বিদ্যাসাগরীয় ভাষার উপর ভিত্তি করেই মার্জিত ও পরিশীলিত চলিত ভাষা। মায়ের মুখ থেকেই মাতৃভাষা শিক্ষা করি—মাতৃভাষাকে আধুনিক রূপদানে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব স্বীকার করে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন —

'মায়ের মুখের ভাষা মাতৃভাষা—এখানে বিদ্যাসাগরকে মাতা মনে করিলে অন্যায় হইবে না—তাঁহার মুখের ভাষা পরবর্তী যুগকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে।'[১১৮ক] বিদ্যাসাগরের ভাষারীতি সার্থক ভাষারীতি হয়ে শুধু সমকালীন চেতনায়ই সীমাবদ্ধ ছিলোনা বরং ভবিষ্যত ভাষারীতির ইঙ্গিতবহও ছিলো। আরেকটি বিষয় এখানে একান্তভাবেই উল্লেখ যোগ্য যে, তাঁর পাঠ্য-পুস্তকগুলো সার্থক ভাষারীতির চিরন্তন নিদর্শন রূপে আজও আমাদের কাছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছে। বিদ্যাসাগরের এ ভাষারীতির দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিণতির সার্থকতার জন্যই বিনয় ঘোষ বলেছেন—

'এক শতাব্দী পরে বাংলা গদ্য ভাষার যে রূপ হবে বা হয়েছে, বর্ণ পরিচয়ের গল্পগুলি বিদ্যাসাগর সে ভাষায় রচনা করে গিয়েছিলেন।'[১১৯]

প্রকৃতপক্ষে "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার যথার্থ শিল্পী ছিলেন।" এবং আধুনিক কথাসাহিত্যে ভাষার স্রষ্টাও তিনি।

মূলত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও বিকাশে বিদ্যাসাগরের অবদানই যে সবচেয়ে বেশী এবং তিনিই যে বাংলা ভাষার সিংহদ্বার উদঘাটন করেছেন—বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিতে তা যতোটুকুই নেতি ধর্ম্মি মানসিকতা থাকনা কেন রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতেই প্রকাশ পেয়েছে যে, বিদ্যাসাগরই মাতৃভাষা বাংলাকে বিশ্ব সভ্যতায় গর্ব ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এ উক্তিতে সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষ হতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ঋণ স্বীকার। তাই এখানে আমাদের রবীন্দ্রনাথের উক্তিকেই স্মরণ করতে হয়—সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগর যে স্মরণীয় তা' আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে গণ্য হয়। বিদ্যাসাগর 'অনুবাদক' ও 'পাঠ্য পুস্তক রচয়িতা মাত্র'—বঙ্কিমের এ উক্তি ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং সাহিত্য প্রতিযোগিতার বিদ্বেষ বহ্নি মাত্র। এ সব উক্তিতে বিদ্যাসাগর নির্বাসিত হননি—বরং তাঁর পথ ধরেই যে, বাংলা সাহিত্য ও ভাষা সাগরে মিলিত হয়ে শুধু বাংলার নয়—বিশ্বের বাণী হয়েছে—এ স্বীকৃতিতেই আজ বিদ্যাসাগর কালের করাল প্রহরাকে এড়িয়ে উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলায় সাহিত্য ভাষার সিংহ-দ্বার উদঘাটন করেছিলেন। তাঁর পূর্ব থেকে এই তীর্থাভিমুখে পথ খননের জন্য বাঙালির মনে আহবান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানা দিক থেকে সে আহবান স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে।...'

'বঙ্গ সাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বার উদঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।'[১২০]—তাই শুধু সুন্দর গদ্য লেখার জন্যই তিনি বাংলা গদ্যের জনক নন, একে মৌল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি জনক।

**এগারো**

বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতির বিরুদ্ধে কথ্যরীতির প্রবর্তনে বিদ্রোহী শিল্পী হিসেবে বিবেচিত ও সমর্থিত। এ

সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে অতি মূল্যায়নেরই ফলশ্রুতি—মূলত যে কথ্যরীতির জন্য প্যারীচাঁদ এতো আলোচিত তাও একটা জেদ ও আস্ফালন মাত্র। কারণ যে-বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ সেই রীতিকেই তিনি আবার গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং প্যারীচাঁদের রীতি যে অচল এর প্রমাণ প্যারীচাঁদ নিজেই। প্যারীচাঁদের ভাষা ও প্যারীচাঁদ-মানসের উপর সবচেয়ে মৌলিক ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। এ বিষয়ে তিনি সবার অগ্রণী।[১২০ক]

প্যারীচাঁদই প্রথম কথ্যরীতির প্রবর্তন করেন এ ধারণাও ঠিক নয়, এ বিষয়ে তিনি বরং ভবানীচরণ, রামনারায়ণ এমনকি মধুসূদন-দীনবন্ধুরও উত্তরপুরুষ। প্যারীচাঁদের কথ্যরীতি আসলে জগাখিচুড়ি ও গুরু-চণ্ডালী ধরনের এক মিশ্রভাষা। এ ভাষা স্থূলতা ও গ্রাম্যতাকে পরিহার করে মার্জিত ও পরিশীলিত হয়ে শৈল্পিক স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। মুখের ভাষাও যে শিল্পিত হয় প্যারীচাঁদ এ বিষয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। আলালী ভাষা প্রসঙ্গে মধুসূদন-প্যারীচাঁদের উক্তি এমনে উল্লেখযোগ্য—

> আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন ?—লোকে ঘরে আটপৌরে যাহা হয় পরিয়া আত্মীয় স্বজন সকাশে বিচরণ করিতে পারে ; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে সে বেশে যাওয়া চলেনা। পোষাকী পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা এখানে। আপনি দেখিতেছি 'পোষাকীর' পাঠ তুলিয়া দিয়া ঘরে-বাহিরে সভাসমাজে সর্বত্রই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহা ও কি কখনও সম্ভব ?
>
> উত্তরে উত্তেজিত প্যারীচাঁদ বলেছিলেন—
>
> তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে ? তবে, জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্তিত এই রচনা পদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে।
>
> উত্তরে মধুসূদন যথার্থই বলেছিলেন—

It is the language of fisherman, unless you import largely from Sanskrit.[১২১]

সাহিত্য বা শিল্পের ভাষা নয় মধুসূদন কথিত এই language of fisherman নিয়েই বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতির বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদের

বিদ্রোহ। আলালী ভাষা বাংলা গদ্যে কোন নতুন রীতির পথদ্রষ্টা নয়, বরং অবক্ষয়মান এক পুরাতনরীতিকেই অনেক খড় কুটোর মত একত্র করে আগুন ধরিয়ে দিয়ছেন। আলালী ভাষার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আর বিদ্যাসাগরীয় ভাষার নিন্দে করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

(ক) "প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।···যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনি তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন···উহাতে প্রথম এই বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত ও প্রচলিত তাহাতে গ্রন্থ প্রণয়ন করা যায়, সে-রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্বজন হৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানুসারিনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ।···এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাহার অক্ষয় কীর্তি।"[১২২]

(খ) "এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইরেজীতে সুশিক্ষিত। ইংরেজীতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবেনা? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেইদিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।[১২৩]

আরবী, ফারসী, হিন্দি, উর্দু মিশ্রিত, সাধু চলিত গুরু চণ্ডালী দোষে দুষ্ট, জগাখিচুড়ির পিণ্ড এ ভাষা নগর বন্দর এলাকার কুলি মজুরদের মুখের অমার্জিত বুলি। অন্য কারো বোধগম্য কথ্য ভাষা নয়। প্যারীচাঁদের যতোই দুঃসাহস থাকনা—শিল্পবোধের পরিচয় নেই বরং গ্রাম্যতা, স্থূলতা ও ছ্যাবলামীই ফুটে উঠেছে। একমাত্র ঠক চাচা,

ঠকচাচী, বাহুল্য, বক্রেশ্বর ও মতিলালের জন্যই এ ভাষা প্রযোজ্য। আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

(ক) "ঠকচাচা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে মোদের নসিব বড় বুরা—মোরা একবারে মেটি হলুম। ফিকির কিছু বেরোয় না। মোর সের থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকাম বি গেল বিবির সাতে বি মোলাকাত হলোনা—মোর বড় ডর তেনা বি পেলটে সাদি করে।"

(খ) "বাহুল্য বলিল—দোস্ত! ওসব বাৎ দিল থেকে তফাৎ কর—দুনিয়াদারী মুসাফিরি,—সেরেক আনা খানা—কোই কিসিকো নেহি—তোমার এক কবিলা, মোর চেট্টে —সব জাহান্নামে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয় তার তদ্বির দেখ।"

(গ) "জাল করিতে, স্বাক্ষী সাজাইয়া দিতে, দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে, গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে, দাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ও হয়কে নয় করিতে, নয়কে হয় করিতে তাহার তুল্য আরেকজন পাওয়া ভার। তাহাকে আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত। তিনিও তাহাতে গলিয়া যাইতেন এবং মনে করিতেন আমার শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে। রমজান ও ঈদ সোবেবরাত আমার করা সার্থক; বোধ হয় পীরের কাছে কষে ফয়তা দিলে আমার কুদরত বাড়িয়া উঠিবে।"

(ঘ) "যেমন দেবা তেমনি দেবী ঠকচাচা ও ঠকচাচী দু'জনই রাজ-যোটক—স্বামী বুদ্ধির বলে রোজগার করে—স্ত্রী বিদ্যার বলে উপার্জন করে। যে স্ত্রীলোক স্বয়ং উপার্জন করে তাহার একটু গুমর হয়, তাহার নিকট স্বমীর নির্জলা মান পাওয়া ভার, এই জন্য ঠকচাচাকে মধ্যে মধ্যে দুই এক বার মুখ ঝামটা খাইতে হইত। ঠকচাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি হররোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও —তাতে মোর লেড়কাবালার কি ফায়দা? তুমি হরঘড়ি বল যে বহুতকাম, এতনাবাতে কি মোদের পেটের জ্বালা যায়? মোর দিল বড় চায় যে জরিজর পিনে দশজন ভালো ভালো রেণ্ডীর বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখিনা, তুমি দেয়ানার মত ফের—চুপচাপ মেরে হাবলিতে বসেই রহ। ঠকচাচা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি যে কোশেশ করি তা কি করে বলব, মোর কেতনা ফিকির,—কেতনা

ফন্দি, —কেতনা প্যাচ—কেতনা শেস্ত তা জবানীতে বলা যায় না। শিকার দস্তে এল এল হয়ে আবার পেলিয়ে যায়। আলবৎ শিকার জলদি এসবে···।"

সংস্কৃতের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ঠিক বিপরীত প্রান্তে ছিলো আলালী ভাষা। আর 'আলালী ভাষা অতিরিক্ত খাদে নামিয়া যায়।'[১২৪]

বঙ্কিমচন্দ্র আলালী ভাষার যতোই মহিমা প্রচার করুন না কেনো 'বরং আলালে যে ধরনের জগাখিচুরী ভাষা ও কৌতুকের বাড়াবাড়ি আছে, যাকে খানিকটা সাগরীভাষার বিপরীত বলা যায়, উত্তরকালে প্যারীচাঁদ সেই রীতি নিজেই ত্যাগ করে প্রকারান্তরে সাগরী গদ্যই অবলম্বন করেছিলেন।···আলালী ভাষা শুধু 'আলালের ঘরের দুলালেই' রয়ে গেছে, প্যারীচাঁদের অন্যান্য রচনা এদিক থেকে আলালী প্রভাবমুক্ত।'[১২৫]

বঙ্কিমচন্দ্র যতোই বিদ্যাসাগরের নিন্দা ও প্যারীচাঁদের প্রশংসা করুন না কেনো বিদ্যাসাগর সাধু ও সংস্কৃতানুসারী গদ্য হতে ক্রমশ সহজ, সরল ও চলিত ঢঙয়ে সার্থক সুন্দর ও শিল্পিত গদ্য লিখেছেন আর প্যারীচাঁদ তথাকথিত কথ্য গদ্য ছেড়ে ক্রমশ জটিলতর গদ্য লিখেছেন। আমাদের আরো মনে রাখতে হবে যে, 'সাহিত্য সংসারে বিদ্যাসাগরী রীতির বৈচিত্র্য উত্তর পুরুষের মধ্য দিয়ে নিজকে সফল করে চলেছে, নিষ্ফলা হয়েছে টেকচাঁদী ভাষারীতি···আলালের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অপ্রচলিত ফারসী শব্দে হুচোট খেয়ে চলতে হবে শিক্ষিত ব্যক্তিকেও। টেকচাঁদ ও বিদ্যাসাগর একই সময়ে নৌকা খুলে দিয়েছেন সত্য, তবে বিদ্যাসাগর খুলে দিয়েছেন আগামী যুগের জোয়ার বুঝে আর টেকচাঁদ খুলে দিয়েছেন ভাঁটার টানে। তাঁর নৌকা বেঁধে আছে ফারসী বহুল শুষ্ক ডাঙায়, সেখানে যেতে হলে তপ্ত বালু আর গভীর কর্দম পেরুতে হবে।[১২৬]

কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতুমী ভাষায় সাধু ও কথ্য দু'রীতিই আছে। তবে হুতুমী ভাষা 'আলালী ভাষা'র মতো আমার্জিত ও খাদযুক্ত নয়। আলালী ভাষা ও হুতুমী ভাষা উভয়েই অশ্লীলতা আছে তবে আলালে আছে বন্দর ও গঞ্জ এলাকার মুটে মুজুরদের ভাষাগত অশ্লীলতা আর হুতুমে আছে উপরতলা তথা অভিজাতদের অশ্লীলতা। এখানে আরো আলোচ্য যে আলালী ভাষা শিল্পরূপ পায়নি—হুতুমী ভাষা শিল্পরূপ পেয়েছিলো।

কলকাতার বনেদী ধনবান ভূম্যধিকারীদের একটি সামাজিক বন্ধন ও সংগঠন গড়ে উঠেছিল রাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতির কাল থেকেই। কালী-প্রসন্ন ছিলেন সেই সমাজের এক শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। হুতুম প্যাঁচার নকসায় তিনি স্বতস্ফূর্ত বলিষ্ঠতা এবং সাবলীলতার সঙ্গে সেই মুখের ভাষাকে মৌখিক অমার্জিত শব্দটিসহ হুবহু প্রয়োগ করেছেন। কলকাতার বনেদী অভিজাত সমাজের মুখের ভাষার কাঠামোর পর চলতি বাংলা গদ্যরীতির প্রথম লেখ্যরূপ নির্মাণের গৌরব 'হুতুমপ্যাঁচারূপী কালী-প্রসন্নর'। তাঁর এ ভাষার প্রধান গুণ সরসতা, ক্ষিপ্রতা, গতি-মুখরতা ও অদম্য প্রাণশক্তি। আর এ গুণেই তা অমার্জিত ও অশালীনতাকে ছাপিয়ে উঠেছে। যেমন—

> 'ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সহরে প্রতিমার অধিবাস হয়ে গ্যালো, কিছুক্ষণ ঢোল ঢাকের শব্দ থামলো। পূজোবাড়ীতে ক্রমে ক্রমে আন্‌রে কর্‌রে এটা কি হলো, কত্তে কত্তে ষষ্ঠীর শর্বরী অবসন্না হলো, শুকতারা মৃদুপবন আশ্রয় করে উদয় হলেন, পাখিরা প্রভাত প্রত্যক্ষ করে ক্রমে ক্রমে বাসা পরিত্যাগ কত্তে আরম্ভ কল্লে, সেই সঙ্গে সহরের চারিদিকে বাজনা বাজি বেজে উঠলে, নব পত্রিকার স্নানের জন্য কর্ম্ম কর্ত্তারা শশব্যস্ত হলেন—ভাবুকের ভাবনায় বোধ হতে লাগলো, যেন সপ্তমী কৌরামাখান নতুন কাপড় পরিধান করে হাসতে হাসতে উপস্থিত হলেন।' [১২৭]

আলালী ভাষার কেনো উত্তরসুরী ছিলোনা—কারণ তা' শিল্পলোকে উত্তীর্ণ হয়ে সাহিত্যের ভাষা হতে পারেনি। কিন্তু হুতোমী ভাষা শিল্পরূপ পেয়েছিলো বলেই এর সূচনার পরিণতি ও সম্ভাবনা আমরা দেখি বিবে-কানন্দ ও বিশেষত গিরীশ ঘোষ এবং অন্যান্যের উপর। আঙ্গিক ও বাকরীতিতে হুতোমীভাষা বাংলা সাহিত্যে একটি সচেতন দিক নির্দেশ করে—'আজকাল বাংলা ভাষা আমাদের মত মূর্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েছে বেওয়ারীশ লুচির ময়দা। তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলে মাত্রই একটা না একটা পুতুল তইরি খ্যালা, তেমনি বেওয়ারীশ বাঙালী ভাষাতে অনেকে যা মনে চায় কচ্ছেন;··· সুতরাং এই নজীরেই আমাদের বাংলা ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিষ নাই যে, আমরা তাহাতে লাগি—সকলই সকল

রকম নিয়ে জুড়ে বসে আছেন—বেশীর ভাগই অ্যাকবেটে, কাজে কাজেই এই নকসাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়লো।'[১২৮] হুতোম প্যাঁচার নকসা কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষারীতিকে প্রতিনিধিত্ব করে—তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে ভাষারীতির কোনো বিবর্তন নেই।

বারো

বিদ্যাসাগরই প্রথম শিল্পিত কথা সাহিত্যের ভাষার স্রষ্টা। আর বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিন্দে ও আলালীভাষার প্রশংসা করলেও বিদ্যাসাগরের ভিত্তির উপরই তাঁর সৌধ গড়ে তুলেছেন। 'বিদ্যাসাগরের রচনারীতি অবলম্বন করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্য লেখা সুরু করেন। দুর্গেশনন্দিনীর রচনাভঙ্গি মোটামুটি হিসেবে বিদ্যাসাগর-পদ্ধতি আশ্রয়ী। মৃণালিনীর মধ্যেও বিদ্যাসাগরী এবং স্বকীয় রীতির মিশ্রণ পাই।··· ক্ষমতাশালী লেখকের হাতে ধীর গম্ভীর বিদ্যাসাগরী রীতি যে কতটা উৎকর্ষ পাইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই কপালকুণ্ডলায়।··· বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন উপন্যাসে এমন অংশ দুর্লভ নয় যাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে বিদ্যাসাগরের লেখার বোধ হইবেনা।[১২৯]

এমনকি তাঁর সামাজিক উপন্যাস 'রজনী'তেও এ প্রভাব অতীব স্পষ্ট—

'কখন দেখিতাম আকাশমার্গে অষ্টশশি সমন্বিত শনৈশ্বর মহাগ্রহ চতুশ্চক্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল, গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল; আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া, দাহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম এই জগৎ জ্যোতির্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মূর্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বরপথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে।' বঙ্কিমের গদ্য বিদ্যাসাগরের গদ্যের ফরমায় শুরু হলেও বঙ্গদর্শনের যুগ থেকেই তাঁর কথা-গদ্যের স্বকীয়তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এবং এ সময়ের তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিষবৃক্ষ'। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিপূর্ণ সার্থকতা যেমন বীরঙ্গনায় তেমনি কথা-গদ্যেও বঙ্কিমের পরিপূর্ণতা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে'।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' হতে উদ্ধৃতির সাহায্য নিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে—

(ক) বাবুদের একটা বড় পুকুর আছে—নাম বারুণী—জল তার বড় মিঠা—রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল। রোহিণী একা জল আনিতে যায়—দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসিতে হাসিতে হালকা কলসিতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি চাল-চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারু নির্মাতা কাল ভুজঙ্গিনীতুল্যা কৃণ্ডলীকৃতা দোলায়মানা মনমোহিনী কবরী। পিতলের কলসি কক্ষে; চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত, মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে রসের কলসি তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া, পাল ভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে রোহিণী-সুন্দরী-সরোবর পথে আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল—এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল।[১৩০]

(খ) দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত প্রসূতি বঙ্গভূমি! এই ঘোর কাল সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙমণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূর প্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জল হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে।

এই কি মা? হ্যাঁ, এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা—এখানে কালগর্ভে নিহিতা।[১৩১]

'বাঙ্গালা ভাষায়' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

'প্রায় সকলদেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতোটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধু ভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না।···গদ্য গ্রন্থাদিতে সাধু ভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না।'[১৩২]

বঙ্কিমের গদ্যরীতি পুরোপুরিভাবে কথ্য বা চলিত রীতিতে গঠিত। পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ ব্যবহারের পরও তাঁর গদ্যরীতিতে কথ্য ভাষার ছাঁচ রয়েছে—

(ক) বর্ষাকাল। রাত্রি জোৎস্না। জোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকার মাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মতো। ত্রিস্রোতানদী বর্ষাকালের জল প্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে, জ্বলিতেছে।[১৩৩]

(খ) রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে-ছোয়া যুঁই ফুলের মতো বড় কোমল প্রকৃতি। তাহার পক্ষে এই জগতের যাহা কিছু সকলই দুর্জ্জেয় বিষম পদার্থ। সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়। বিশেষ মুসলমান রাজা, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়।[১৩৪]

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বলেছেন—

১ সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।[১৩৫]

২ রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা।[১৩৬]

৩ বিষয়ানুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।[১৩৭]

৪ ···যে ভাষা সকলের বোধগম্য···যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত।[১৩৮]

উপরের সূত্রগুলো বঙ্কিমের লেখাতেও সার্থকতার সাথে প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্কিমের সমস্ত লেখায়ই তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ প্রতিফলিত। এবং আরো উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর গদ্য গাম্ভীর্য থেকে স্পষ্টতা ও সরলতায় উন্নীত।

**তেরো**

আমরা আগেই বলেছি বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের ভিত্তির উপরই বঙ্কিম-গদ্যরীতির স্বকীয়তা ও প্রতিষ্ঠা অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের গদ্যে যেমন 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' ও কোন কোন ছোট গল্পে বঙ্কিম-গদ্যরীতির প্রভাব লক্ষণীয়। কিন্তু রবীন্দ্র-গদ্যরীতি একমাত্র রবীন্দ্র-নাথেরই। গদ্যভাষাকে নিয়ে এতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো শিল্পীই করেননি। বরাবরই তিনি নতুন নতুন গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর অনুরোধে 'সবুজপত্রে' তিনি চলিতরীতিতে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস লিখেন। এ চলিত রীতিতে প্রমথ চৌধুরীর চলিত রীতির কোনো প্রভাব নয় এ একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজের।

বাংলা গদ্যকে মৌলভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করলেন বিদ্যাসাগর, এ ভিত্তির উপরই বঙ্কিমের প্রতিষ্ঠা আর রবীন্দ্রনাথের গদ্য বঙ্কিম প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে।

পলাশীর বিপর্যয়ের পর রাজ্যহারা হয়ে মুসলমানেরা প্রায় শতাব্দীকাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে এক নির্লিপ্ত জীবন যাপন করে। শতাব্দী পরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে আবার শিক্ষিত নতুন মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজ গড়ে উঠে। এদের নেতৃত্বে ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ।

ইংরেজ রাজত্বে হিন্দুদের মধ্যে যেমন বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতায়নের প্রবণতা দেখা যায়—নতুন মুসলিম মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মধ্যেও বাংলা ভাষাকে আরবী-ফারসী-উর্দ্দু প্রভাবে রূপ দেবার কৃত্রিম প্রচেষ্টা দেখা দেয়। বাংলা গদ্যে এখানে আর এক বিপর্যয়ের পর্ব। যা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আলোচনা বিষয়।

তথ্যনির্দেশ

১ বিদেশীরা যখন বাংলা গদ্য লিখতে শুরু করেন তখন তাদের সামনে বাংলা গদ্যে লেখা কোনো বইপুস্তক বা ব্যাকরণ ছিলোনা এবং এমনকি বাংলা গদ্যের কোনো আদর্শ বা লেখ্য নিদর্শনও তাঁদের সামনে ছিলোনা। তাই তাঁরা মনে করতেন যে, তাঁরাই প্রথম বাংলা গদ্য লিখছেন।

২ সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ পুরোনো বাংলা গদ্যের নিদর্শন পেয়েও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পূর্ববর্তী বাংলাগদ্যকে স্বীকৃতি দেননি। যেমন সুকুমার সেনের মন্তব্য—'গদ্য সাহিত্যের উদ্ভবের সম্ভাবনা প্রাচীন সাহিত্যে অসম্ভাবিত ছিল। কেননা ইহার আবেদন তত্ত্ববোধ ও যুক্তিজ্ঞানে।'
সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কোলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮৩, পৃ. ৩

৩ সফিউদ্দিন আহমদ; বাংলা গদ্য ও গদ্য শিল্পী, আলী পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ. ১৫

৪ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রথম খণ্ড-প্রাচীন যুগ); রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, পরিমার্জিত পুর্নমুদ্রণ, আশ্বিন, ১৩৮২, পৃ. ৭, ২৭

৫ আনিসুজ্জামান; পুরোনো বাংলা গদ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৯০, পৃ. ১৬

৬ দীনেশচন্দ্র সেন; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

৭ তাঁর পুরো উক্তিটা হচ্ছে—

…There exisited a considerable ammount of Bengali Prose writing long before the Serampore Missionaries or the

pandits of the Fort William College, or even Raja Rammohan-Ray, in the early years of the nineteenth century, ever dreamt of' creating a general prose-style. The existence of these specimens of prose-writing will in itself remove the impression still obtaining in some quarters, that Bengali prose is entirely a creation of the nineteenth century.

ডক্টর আনিসুজ্জামানের 'পুরোনো বাংলা গদ্য' হতে উদ্ধৃত, পৃ. ১৭

৮ সজনীকান্ত দাস ; বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, প্রথম চিরায়ত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৮২, পৃ. ৮

৯ সুকুমার সেন ; বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কোলকাতা পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮৩, পৃ. ৭

১০ ঐ, পৃ. ৭-৮

১১ ঐ, পৃ. ৩

১২ আনিসুজ্জামান ; 'পুরেনো বাংলা গদ্য', বাংলা একডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৯০, পৃ. ১৯-২০

১৩ সুকুমার সেন ; বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ. ৬

১৪ সফিউদ্দিন আহমদ, বাংলা গদ্য ও গদ্য শিল্পী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১৪ সজনীকান্ত দাস ; পূর্বোক্ত পৃ. ২

ক

১৫ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ; বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, ক্লাসিক প্রেস, কোলাকতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৭৪, পৃ. ৫১-৫২

১৬ প্রমথ চৌধুরীর উক্তি, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস হতে উদ্ধৃত, পৃ. ৫৪

১৭ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, 'মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা', কোলকাতা, ২য় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৭২, পৃ. ১৯

১৮ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ সাহিত্যে গদ্যের উদ্ভব,' 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' হতে উদ্ধৃত, পৃ. ২০

১৯ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃ. ২৫
২০ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
২১ শূন্য পুরান, ডক্টর আনিসুজ্জামানের 'পুরোনো বাংলা গদ্য' হতে উদ্ধৃত পৃ. ৫১
২২ আনিসুজ্জামান, পুরোনো বাংলা গদ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১
২২ শূন্য পুরান, পৃ. ৫১
ক
২৩ শ্রীরূপ গোস্বামীর কারিকা, সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' হতে উদ্ধৃত, পৃ. ১০
২৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী-২৬, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, চৈত্র ১৩৭৪, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭
২৫ আনিসুজ্জামান 'পুরোনো বাংলা গদ্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
২৬ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিত কুমার দত্ত ; বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা, কোলকাতা, ২য় সংস্করণ অগ্রাহায়ণ, ১৩৭২ পৃ. ৫
২৭ আনিসুজ্জামান, পুরোনো বাংলা গদ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
২৮ সজনীকান্ত দাস; বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২-১৩
২৯ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ভাষা', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৭৬, পৃ. ৩৭৩
৩০ আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
৩১ সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
৩২ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা, 'কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ',
৩৩ ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য' হতে উদ্ধৃত, পৃ. ১১
৩৪ আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
৩৫ দীনেশচন্দ্র সেন ; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
৩৬ আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
৩৭ সজনীকান্ত দাস ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪
৩৯ পূর্বোক্ত গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত, পৃ. ১৪

৪০ A Grammer of Bengali Language-এ হ্যালহেড সাহেব চিঠিটির পুরোটাই তুলে ধরেছেন। ডক্টর আনিসুজ্জামান তাঁর 'পুরোনো বাংলা গদ্যে' এবং সজনীকান্ত দাস তাঁর 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে' এর উল্লেখ করছেন।

৪১ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৪২ আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

৪৩ রামগতি ন্যায়রত্ন ; বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, পৃ. ২০২

৪৪ এইচ. টি. কোলব্রুক, এশিয়াটিক রিচার্সসেস, (১৮০১) Vol-VII, পৃ. ২২৩

৪৫ সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮

৪৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৪৭ A Grammer of Bengali Language-এহ্যালহেড উল্লেখ করেছেন। পৃ. ২০৭-১২

৪৮ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত ; বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, পৃ. ১৩

৪৯ রামমোহন রচনাবলী ; অজিতকুমার ঘোষ, (ভূমিকা) হরফ প্রকাশনী, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নববর্ষ ১৩৮০

৫০ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গ্রন্থাবলী, রঞ্জন পাবলিশার্স (কোলকাতা), ভূমিকা

৫১ গল্পটি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের—

আমাদের শুনা আছে যে, এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লিখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক কহিয়াছিলেন—এ কি হয়েছে !—এযে বিদ্যা-সাগরীয় বাঙ্গালা হয়েছে ! এযে অনায়াসে বোঝা যায় !!

রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২০৬

৫২ বাঙ্গালা ভাষা, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৩

৫৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; 'বাংলাভাষা পরিচয়' ; রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত পৃ. ৩৬৫

৫৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; 'ছন্দ', রবীন্দ্র রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৩৬৫, পৃ. ৩৩৩

৫৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; 'বাংলা ভাষা পরিচয়' পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮

৫৬ জোনাথান ডানকান-এর গদ্য, সজনীকান্ত দাসের বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস হতে উদ্ধৃত, পৃ. ৪০–৪১

৫৭ এন. বি. এডমোনস্টোনের গদ্য, পূর্বোক্ত হতে উদ্ধৃত, পৃ. ৪১

৫৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৫৯ সবিতা চট্টোপাধ্যায় ; 'বাংলা সাহিত্যে ইউরেপীয় লেখক', পৃ. ১৬১

৬০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

৬১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

৬২ জন মিলারের গদ্য। সজনীকান্ত দাসের বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস হতে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৫

৬৩ আনিসুজ্জামান, 'পুরোনো বাংলা গদ্য', হতে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৭–৬৮

৬৪ সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৬৫ পাবলিক ডিপার্টমেন্টের ইস্তেহার, কোলকাতা (৩-১-১৭৯৯)

৬৬ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ মিনিট ১৮ই আগস্ট, ১৮০০

৬৭ কেরীর বক্তৃতা, পাবলিক ডিসপিউটেলনেস (২০-৯-১৮০৪)

৬৮ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৬৯ ধর্মপুস্তক, প্রথম সংস্করণ (১৮০১), পৃ. ১

৭০ কেরী মদনাবাটি অবস্থান কালে একটি চিঠিতে ধর্ম পুস্তকের যে অনুবাদ করেছিলেন তাই পাঠান। সজনীকান্ত দাসের বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস হতে উদ্ধৃত, পৃ. ১২৩

৭১ সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' হতে উদ্ধৃত, পৃ. ৭৯

৭২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-৮০

৭৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০

৭৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

৭৫ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একটি বাৎসরিক সভায় এ বক্তব্য রেখেছিলেন। ভূদেব চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' ২য় খণ্ড হতে উদ্ধৃত, পৃ. ৯৩

৭৬ রাম রাম বসু, লিপিমালা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গ্রন্থমালা, রঞ্জন পাবলিশার্স, কোলকাতা।

৭৭ কেরীর ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

৭৮ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৭৯ Notes on Sanskrit College, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দেবকুমার বসু সম্পাদিত।

৮০ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৮০ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার : বেদান্তচন্দ্রিকা, পৃ. ২০১

ক

৮১ পূর্বোক্ত, প্রবোধচন্দ্রিকা, পৃ. ২৭১-৭২

৮২ পূর্বোক্ত, বেদান্তচন্দ্রিকা, পৃ. ২১৩

৮৩ পূর্বোক্ত, হিতোপদেশ, পৃ. ৪-৫

৮৪ পূর্বোক্ত, বত্রিশসিংহাসন, পৃ. ৭

৮৫ পূর্বোক্ত, হিতোপদেশ, পৃ. ১২

৮৬ গোপাল হালদার ; বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, পৃ. ৯২-৯৩

৮৭ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; 'বাঙ্গালাভাষা', হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত 'বাঙলা ভাষা' (বাংলা একাডেমী প্রকাশিত) হতে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৯৯

৮৮ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৮৯ 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' হতে উদ্ধৃত, পৃ. ৩২

৯০ সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৯১ পূর্বোক্ত, গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত, পৃ. ১১০-৭১

৯২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

৯৩ সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

৯৪ 'লিপিমালা' (ভূমিকা), রাম রাম বসু

৯৫ সজনীকান্ত দাস, উদ্ধৃত, পৃ. ১৭৬-৭৭

৯৬ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-১৯

৯৭ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬

৯৮ শিবনাথ শাস্ত্রী; 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৪, পৃ. ৬৫

৯৯ 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' হতে উদ্ধৃত, পৃ. ৪১

১০০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; 'আধুনিক সাহিত্য' (বঙ্কিমচন্দ্র), রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৯

১০১ প্রমথ চৌধুরী ; 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮০

১০২ রামমোহন রায়; 'কঠোপনিষৎ', রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কোলকাতা, নববর্ষ ১৩৮০, পৃ. ১৩৪

১০৩ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

১০৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিতা', ডক্টর ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, ভূমিকা, জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৭৫

১০৫ 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর গ্রন্থ-পরিচিত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১০৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বিদ্যাসাগর চরিত', : 'চারিত্রপূজা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, পৃ. ৪৭৭

১০৭ ক্ষেত্র গুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় থেকে বিদ্যাসাগর, 'বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশক—বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ, মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৮১, পৃ. ৭১-৭২

১০৮ সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার : 'বাঙালী জীবনে বিদ্যাসাগর'

১০৯ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

১১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'চারিত্র পূজা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৮

১১১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; 'বাঙ্গালা ভাষা', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, ৪র্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৩৭৬, পৃ. ৩৭০

১১২ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

১১৩ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলাপচারী বিদ্যাসাগর' হতে উদ্ধৃত, পৃ. ১২৬

১১৪ সুকুমার সেন ; 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

১১৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; বাঙ্গালা ভাষা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৩

১১৬ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

১১৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

১১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

১১৯ বিনয় ঘোষ ; 'বাঙালী সমাজে বিদ্যাসাগর',

১২০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বিদ্যাসাগরচরিত' ; "চারিত্রপূজা", পৃ. ৪৭৬

১২০ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ; 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী'র ভূমিকা, কথাকলি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ. ২৭শে কার্তিক ১৩৭৫

১২১ নগেন্দ্রনাথ সোম ; 'মধুস্মৃতি', পৃ. ৮২-৮৩

১২২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; "বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান", বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কোলকতা, ৪র্থ মুর্দ্রণ, আশ্বিন ১৩৭৬, পৃ. ৮৬৩

১২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬৪

১২৪ অরবিন্দ পোদ্দার ; 'বঙ্কিম মানস', ইণ্ডিয়ানা, চতুর্থ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৮৩, পৃ. ৮৩

১২৫ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী'র ভূমিকা, মণ্ডল বুক হাউস, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১২ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮

১২৬ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

১২৭ কালীপ্রসন্ন সিংহ ; 'হুতোম প্যাঁচার নকসা', পৃ. ৮৭

১২৮ কালীপ্রসন্ন সিংহ ; 'হুতোম প্যাঁচার নকসা', ভূমিকা

১২৯ সুকুমার সেন ; 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

১৩০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; 'কৃষ্ণকান্তের উইল', বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, ৪র্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৩৭৬, পৃ. ৫৪৮

১৩১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; 'কমলাকান্তের দপ্তর', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, ৪র্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৩৭৬, পৃ. ৭৯-৮০

১৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯

১৩৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; 'দেবী চৌধুরাণী', বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২৩

১৩৪ পূর্বোক্ত, 'সীতারাম', পৃ. ৮৮৭

১৩৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; "বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি", বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

১৩৬ 'বাঙ্গালাভাষা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯

১৩৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯

১৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯